বাংলা জার্নাল অব ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্সেস
Bangla Journal of Interdisciplinary Sciences

ISSN: 2981-8184

Volume 1 (2), 2023

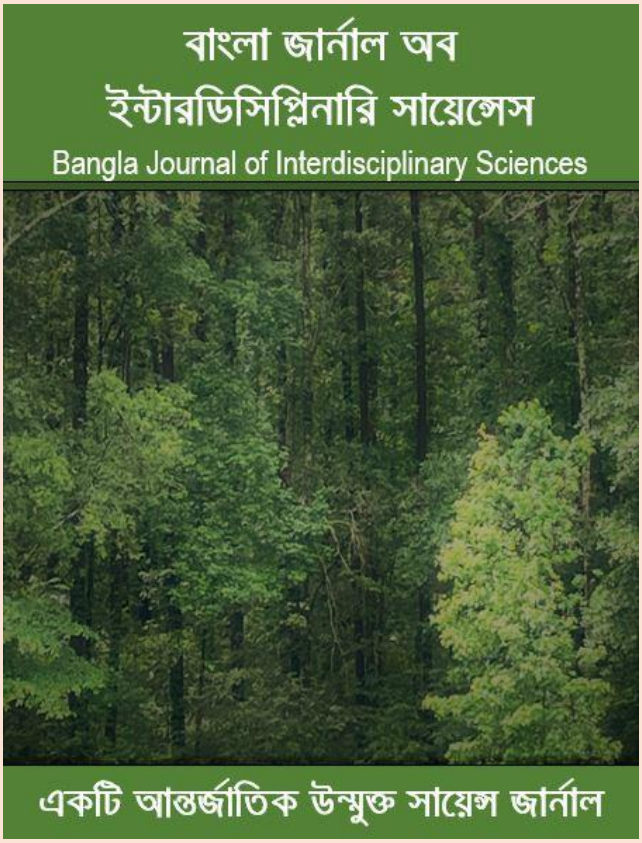

In This Issue:

The Effects of Ocean Plastic Pollution on Marine Ecology *(pp: 1-14)*
M. S. Zaman, Rakeen S. Zaman, Robert C. Sizemore, Ragib A. Khan

The Prospect of SMR Technology in the Remote Areas of Bangladesh for Nuclear Energy Production *(pp: 15-28)*
A.F.M. Mizanur Rahman, Shanjib Karmaker, K.M. Jalal Uddin Rumi, Rahnuma Siddique, Farhana Islam, Md. Rubel Ali Biswash, Md. Abdur Razzaque, Abid Imtiaz

Interesting Astronomical Bodies *(pp: 29-40)*
Oishik Adib, Courtney L. Broadbent, Sharonika Sharon

Transmission, Symptoms, Treatment, and Prevention of Dengue Fever: A Formidable Healthcare Challenge in Bangladesh *(pp: 41-50)*
M. Iftekhar Ullah, Iftekhar Rafiquallah, M. S. Zaman

Climate Change and Water Security of Bangladesh *(pp: 51-62)*
Ali Shafqat Akanda, Wahid Palash

The Bangla Journal of Interdisciplinary Sciences (BJIS) is an international, peer-reviewed, open access journal that publishes scientific articles in Bangla from all branches of science from all around the world.

BJIS especially encourages the younger generation of scientists, and future scientists to publish their research in their mother tongue, and hopes to serve as an effective platform to bring Bengali scientists and science-minded people, who are sacttered throughout the world together for a common goal.

PUBLISH YOUR WORK FOR FREE

Submitted articles must be original works and free from personal, political, and social biases. The respective authors retain the copyrights and are fully responsible for the content they publish.

বাংলা জার্নাল অব ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্সেস

Bangla Journal of Interdisciplinary Sciences

আমাদের এই উদ্যোগে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।
মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রসারিত করুন এবং
আগামী প্রজন্মের মাঝে সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটান।

Level 13, Suite 13.1
32 Smith Street
Parramatta, NSW 2150
Australia

Emails: editorsbjis@banglasciencejournal.com
editorsbjis@gmail.com (preferred)
© Copyright: Bangla Journal of Interdisciplinary Sciences

THE EXECUTIVE BOARD

EDITORS

Md Sarwar Zaman, PhD, FMAS
Professor Emeritus, Alcorn State University
Lorman, MS, USA
Professor, South Texas College
McAllen, TX, USA

Ragib Ahsan Khan, MS
Freelance Author and Researcher
Vienna, Austria

ASSOCIATE EDITORS

Ali Shafqat Akanda, PhD
Associate Professor of Civil Engineering
University of Rhode Island
Kingston, RI, USA

Nilufa Ahsan, PhD
Professor & Chair, Dept. of Bangla
Adamjee Cantonment College
Dhaka, Bangladesh

M. Iftekhar Ullah, MD, MPH
Associate Professor of Medicine
University of Mississippi Medical Center
Jackson, MS, USA

ADMIN & COMMUNICATION

Munzurul Khan
Principal, Keshab Chartered Accountant
Chairman, KHI Partners,
NSW, Australia

THE PRODUCTION TEAM

Bryan Santos, B.Bus
KHI Partners, NSW, Australia
Merger & Acquisition Solutions
NSW, Australia

Rakeen S. Zaman, BS
Software Engineer
C Spire Corporate
Ridgeland, MS, USA

Kamrul A. Khan, MA
Graphic Designer & Sr. Manager
Print Britannia
London, UK

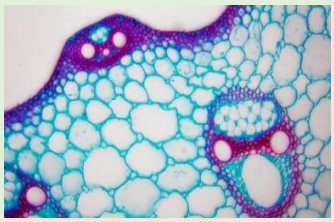

সম্পাদকীয়

২০২৩ সালের ২৬ শে মার্চ "বাংলা জার্নাল অব ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্সেস" এর অগ্রযাত্রায় একটি স্মরণীয় দিন। কারণ এইদিনে প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জার্নালটির প্রতিষ্ঠা ও পদযাত্রা ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সেটা ছিল প্রায় এক বছর ধরে আমাদের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার ফসল। এটা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমরা অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি এবং সম্মিলিত চেষ্টায় সেসব প্রতিকূলতা অতিক্রমও করেছি। এই লব্ধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পরবর্তী সংখ্যাগুলির প্রকাশ সহজতর হবে বলে আমি আশা করি। এই সংখ্যার জন্য প্রবন্ধ রচনা, পিয়ার-রিভিউ, প্রুফরিড, ওয়েব ডিজাইন ও আনুষাঙ্গিক সহায়তায় জড়িত সবাইকে আমি জার্নালের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিজ্ঞানের ক্রমাগত অগ্রগতি মূলত অসংখ্য মানুষের উদ্ভাবনী চিন্তা এবং সেইসব চিন্তাকে বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টারই ফসল। যেকোনো জাতির উন্নয়নের পিছনে সে জাতির বিজ্ঞান চর্চার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের অগ্রগতির অবদান অপরিসীম। কোনো উদ্ভাবনের অন্তরালে কাজ করে মূলত মানুষের কল্পনাশক্তি। বিজ্ঞান মানুষের এই কল্পনার সফল বাস্তবায়ন। স্বয়ং আলবার্ট আইনস্টাইন বলে গিয়েছেন, "imagination is more important than knowledge" প্রকৃতঅর্থে একজন মানুষের পক্ষে তার নিজের ভাষায় কোনোকিছু কল্পনা বা চিন্তা করা এবং তা প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে সহজতর। কেননা সে যে ভাষায় কথা বলতে, চিন্তা করতে, এবং স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত, সেই ভাষায় সে তার সৃষ্টিশীল চিন্তা-ভাবনাগুলিকে সহজেই প্রকাশ করতে এবং ছড়িয়ে দিতে পারবে।

একজন প্রবাসী বাঙালি হিসেবে এবং বিজ্ঞানের সাথে আমার দীর্ঘদিনের পেশাগত সম্পর্কের কারণে আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সার্বিক অগ্রগতির জন্য বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। একই সাথে বিশ্বাস করি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ফলিত গণিত এবং ইংরেজি শিক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করাও অত্যন্ত জরুরি। কেননা গণিতের জ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হবে এবং যেহেতু আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল এবং অধিকাংশ বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ,

THE EDITORIAL BOARD

Partha Bhattacharjee, PhD
Professor of Biology
Xavier University, New Orleans, LA, USA

Syed Muniruzzaman, PhD
Assoc. Professor of Biology
Xavier University, New Orleans, LA, USA

Robert C. Sizemore, PhD
Professor of Biology
Alcorn State University, MS, USA

বাংলা জার্নাল অব ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্সেস

বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার একটি মাধ্যম

Pictures: gettyimages.com

জার্নাল এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলি মূলত ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়, সেগুলিকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারা, বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে এর পাশাপাশি বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের সাধনাকে আরো সহজতর করার ক্ষেত্রে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্বও অপরিসীম। আর এদেরকে সেই ভিত্তি তৈরি করে দেওয়ার পিছনে শিক্ষকদের ভূমিকা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, যেমন: রেডিও ও টিভি চ্যানেলগুলিতে বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানের সম্প্রচার বাড়ানো, বাংলা পত্র-পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনার সুযোগ প্রসারিত করা, এ ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

বাঙালি পরিশ্রমী এবং মেধাবী জাতি। দেশে এবং বিদেশে অনেক মেধাবী বাঙালি বিজ্ঞানী ছড়িয়ে আছেন যারা চেষ্টা করলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। আমরা আশা করবো বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের বাঙালি বিজ্ঞানীরা তাঁদের চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশের জন্য ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষার পাশে বাংলাকেও একটি মাধ্যম হিসাবে বাবহার করবেন। এটা একদিকে যেমন বাংলা ভাষাকে আরো বিকশিত করবে, অন্যদিকে আমাদের শিক্ষা এবং জীবনের মান উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

মো. সারওয়ার জামান
টেক্সাস, যুক্তরাষ্ট্র

Acknowledgement to Reviewers of Bangla Journal of Interdisciplinary Sciences

The second issue of Volume 1 for the *Bangla Journal of Interdisciplinary Sciences (BJIS)* is now published. On behalf of the journal, we extend our sincere gratitude to the reviewers who generously contributed their time and expertise in evaluating the manuscripts for this edition.

Like its peer-reviewed counterparts, BJIS depends on the expertise of professionals to assess the submitted manuscripts' quality for publication. Reviewing scientific papers is a rigorous and time-intensive task, often challenging due to professionals' multiple commitments. Fortunately, BJIS has been privileged to receive unwavering assistance from dedicated reviewers with significant qualifications and established expertise in their fields. This consistent support remains vital for our journal's ongoing success. We extend our heartfelt appreciation once more to all reviewers for their invaluable efforts, crucially aiding BJIS's progress and sustainability. Finally, we humbly extend a special acknowledgement to Dr. Nilufa Ahsan for her essential contribution in proofreading all manuscripts before their final publication.

M. S. Zaman
Texas, USA

Table of Contents

The Effects of Ocean Plastic Pollution on Marine Ecology 1-14

M. S. Zaman[1,2,*], Rakeen S. Zaman[3], Robert C. Sizemore[1], Ragib A. Khan[4]

[1]Department of Biological Sciences, Alcorn State University, Lorman, MS 39076, USA; [2]Department of Biology, South Texas College, McAllen, TX 78501, USA; [3]Bagley College of Engineering, Mississippi State University, Starkville, MS, 39762, USA; [4]Freelance Author and Researcher, Vienna, Austria, +43

The Prospect of SMR Technology in the Remote Areas of Bangladesh for Nuclear Electricity Production 15-28

A.F.M. Mizanur Rahman[1], Shanjib Karmaker[1], K.M. Jalal Uddin Rumi[1], Rahnuma Siddique[1], Farhana Islam[1], Md. Rubel Ali Biswash[2], Md. Abdur Razzaque[1], Abid Imtiaz[3]

[1]Construction of Rooppur Nuclear Power Plant Project, Bangladesh Atomic Energy Commission, Bangladesh; [2]Atomic Energy Centre, Bangladesh Atomic Energy Commission, Bangladesh; [3]Nuclear Safety, Security and Safeguards Division, Bangladesh Atomic Energy Commission, Bangladesh

Interesting Astronomical Bodies 29-40

Oishik Adib[1,*], Courtney L. Broadbent[2], Sharonika Sharon[3]

[1]Department of Molecular Sciences, Macquarie University, Sydney NSW 2109, Australia; [2]Freelence Author and Researcher, Sydney Australia +60; [3]Department of Mathematics and Natural Sciences, Brac University, Dhaka 1212, Bangladesh

Transmission, Symptoms, Treatment, and Prevention of Dengue Fever: A Formidable Healthcare Challenge in Bangladesh 41-50

M. Iftekhar Ullah[1], Iftekhar Rafiquallah[2], M. S. Zaman[3,4,*]

[1]Department of Medicine, University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi 39216, USA; [2]Department of Microbiology, University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi 39216, USA; [3]Department of Biological Sciences, Alcorn State University, Lorman, MS 39076, USA; [4]Department of Biology, South Texas College, McAllen, TX 78501, USA

Climate Change and Water Security of Bangladesh 51-62

Ali Shafqat Akanda[1*], Wahid Palash[2]

[1]Department of Civil and Environmental Engineering, University of Rhode Island, Kingston, RI 02881, USA; [2]Integrated Sustainability, Calgary, AB T2P 4H2, Canada

REVIEW PAPER

The Effects of Ocean Plastic Pollution on Marine Ecology

M. S. Zaman[1,2,*], Rakeen S. Zaman[3], Robert C. Sizemore[1], Ragib A. Khan[4]

[1]Department of Biological Sciences, Alcorn State University, Lorman, MS 39076, USA
[2]Department of Biology, South Texas College, McAllen, TX 78501, USA
[3]Bagley College of Engineering, Mississippi State University, Starkville, MS 39762, USA
[4]Freelance Author and Researcher, Vienna, Austria, +43

**Corresponding Author: M. S. Zaman*
Corresponding Email: zaman@alcorn.edu, mzaman@southtexascollege.edu

Received: 12/15/2022 / Accepted: 1/22/2023

https://doi.org/10.5281/zenodo.7864063

ABSTRACT

The significant role of plastic in advancing human civilization is indisputable. Plastic products have become an essential part of human lives. On the other hand, discarded plastic products pollute the environment. Most of the plastic products are eventually returned to the environment as plastic wastes. Since plastic wastes are not easily biodegradable, they remain in the environment for a long period of time and pose a threat to the ecosystems. Data indicate that about 79% of the plastic ever produced, came back into the environment as waste. These wasted plastics immediately pollute the land and a substantial part of this eventually flows into the oceans through various routes. Currently, wasted plastic products represent about 70% of the total ocean pollutants and plastic debris have been associated with the deaths of over a million seabirds and about 100,000 marine animals every year. Plastic products are photodegradable and thus with the actions of sunlight and saltwater, ocean plastic debris break down into microplastics. Some of these microplastics resemble plankton, and thus they are being consumed by fish, shellfish, and various other marine organisms, and eventually enter the larger animals through the ocean food chain. Studies indicate that ingested microplastics may have disastrous impacts on marine fauna. Through the consumption of seafood, microplastics may potentially endanger human food safety and pose a threat to human health. Unfortunately, at present, due to lack of sufficient data, it isn't possible to determine the long-term effects of microplastic exposure on marine organisms or human health.

Keywords: Ocean plastic pollution, microplastic, plastics in pelagic organisms, ocean gyres, garbage patch.

Cite this article as: *Zaman, M.S., Zaman, R.S., Sizemore, R.C., Khan, R.A. 2023, The Effects of Ocean Plastic Pollution on Marine Ecology, Bangla J. Interdisciplinary Sci., 1 (2): 1-14.*

প্লাস্টিক দূষন এবং সমুদ্রের পরিবেশের উপর তার অপ্রতিকূল প্রভাব

সারাংশ

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্লাস্টিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্লাস্টিক সামগ্রী ক্রমশ আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার একটা অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। তবে প্লাস্টিকের দৈনন্দিন ও যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে বিপুল পরিমাণ আবর্জনারও উৎপন্ন হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যবহৃত প্লাস্টিক খুব অল্প পরিমাণই রিসাইক্লিং হয় এবং প্লাস্টিক সামগ্রীর প্রায় ৭৯ শতাংশই আবর্জনা হিসেবে আবার পরিবেশে ফিরে আসে। আর এই প্লাস্টিক আবর্জনার একটা বড় অংশ নানা উপায়ে ক্রমান্বয়ে সমুদ্রে পৌঁছে সমুদ্রকে দূষিত করে। সাম্প্রতিক কালে প্লাস্টিক-দূষণ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েই চলেছে। প্লাস্টিক-দূষণের কারণে প্রতি বছর প্রায় দশ লক্ষ সামুদ্রিক পাখি এবং লক্ষাধিক অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাচ্ছে। সূর্যকিরণ এবং সমুদ্রের লবনাক্ত পানির প্রভাবে এই প্লস্টিকগুলি ভেঙে ক্ষুদ্র মাইক্রোপ্লাস্টিকে (Microplastics) পরিণত হয়। ক্ষুদ্র মাইক্রোপ্লাস্টিক কণাগুলি প্লাঙ্কটনের (Plankton) মতো সমুদ্রের পানিতে ভাসতে থাকে । মাছসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী কখনো কখনো এগুলো খেয়ে ফেলে। ফলে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্লাস্টিক ও মাইক্রোপ্লাস্টিক লক্ষ্য করা যায়। এই প্লাস্টিক এবং মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলি সামুদ্রিক প্রাণীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর। অন্যদিকে আমরা যখন জলজ প্রাণী (Seafood) খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করি তখন এই মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের শরীরে প্রবেশ করে; যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে আমাদের হাতে যথেষ্ট ডাটা না থাকার কারণে সামুদ্রিক প্রাণী এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মাইক্রোপ্লাস্টিকের প্রভাব সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধে সমুদ্রের পানিতে প্লাস্টিক দূষণের ভয়াবহতা এবং সামুদ্রিক প্রাণী ও পরিবেশের উপর তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মূল শব্দগুলি: সমুদ্রের প্লাস্টিক দূষণ, মাইক্রোপ্লাস্টিক, সামুদ্রিক প্রাণীর উপর প্লাস্টিকের প্রভাব এবং সমুদ্রের চক্রগতি।

ভূমিকা

প্লাস্টিক মূলত একটি সিনথেটিক কার্বন পলিমার যা একই ধরনের অণুর একটি লম্বা শৃঙ্খল সমন্বয়ে গঠিত। এই পলিমারসএর উদাহরণ পলিথিন, পলিভিনাইলক্লোরাইড (PVC), লাইলন ইত্যাদি। প্লাস্টিক শব্দটি একটি ল্যাতিন শব্দ ‘Plasticus’ এবং একটি গ্রিক শব্দ ‘Plastikos’ থেকে উদ্ভুত। এ দুটি শব্দেরই অর্থ হল যাকে আকৃতি দেয়া যায় (ACS,1993)। প্লাস্টিক একটি হালকা ও স্থিতিস্থাপক ক্ষমতাসম্পন্ন উপাদান। অর্থাৎ এই উপাদানটিকে না ভেঙেও প্রচণ্ড চাপ ও নিষ্পেষণের মাধ্যমে শুধু অবকাঠামোকে পরিবর্তন করা যায়। এভাবে এগুলিকে বিভিন্ন ছাঁচে (Mold) রূপ দিয়ে অসংখ্য নিত্য ব্যবহার্য পণ্য তৈরি করা সম্ভব। সহজলভ্য, স্বল্পমূল্য এবং বহুমুখী ব্যবহারের সুবিধার জন্য প্লাস্টিক একটি অত্যন্ত জনপ্রিয়

উপাদান; যার চাহিদা আমাদের জীবনের সর্বস্তরে অপরিসীম। পানির বোতল থেকে শুরু করে মহাকাশযানের মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তৈরির ক্ষেত্রেও এই উপাদানটির ব্যবহার অনস্বীকার্য ।

ব্রিটিশ ধাতুবিদ্যা বিশারদ (Metallurgist) আলেকজান্ডার পার্কস (Alexander Parkes) ১৮৫৬ সালে প্লাস্টিক আবিষ্কার করেন এবং এর নাম দেন 'Parkesine'। ১৯০৭ সালে বেলজিয়ান-আমেরিকান বিজ্ঞানী লিও বেকল্যান্ড (Leo Baekeland) বাণিজ্যিকভাবে প্রথম প্লাস্টিক উৎপাদন করেন এবং এর নাম দেন 'বেকলাইট' (Bakelite) (Knight, 2014)। বেকলাইট আবিষ্কার প্লাস্টিক উৎপাদনে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচণ করে। বেকলাইট ছিল তাপ এবং বিদ্যুৎ প্রতিরোধক ক্ষমতা সম্পন্ন। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য বেকলাইট প্রতিরক্ষা, বৈদ্যুতিক ও গাড়ির যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন (ACS,1993)। বেকলাইটের উৎপাদন ছিল শ্রমসাধ্য (Knight, 2014), তাই এই উপাদানটির বিকল্প প্লাস্টিকের আবিষ্কারের পর বেকলাইটের চাহিদা অনেক কমে যায়। পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিকের কতগুলো বহুল ব্যবহৃত বাণিজ্যিক উপাদান আবিষ্কার করেন। যেমনঃ পলিস্টেরিন, পলিয়েস্টার, পলিভিনাইলক্লোরাইড এবং লাইলন; যা যথাক্রমে ১৯২৯, ১৯৩০, ১৯৩৩ এবং ১৯৯৫ সালে আবিষ্কৃত হয় (Knight, 2014)।

স্বল্প উৎপাদন খরচ, বহুমুখী ব্যবহার এবং সহজলভ্যতার কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্লাস্টিক পণ্য আমাদের জীবনের নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠে। ১৯৫০ সালে বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় দুই মিলিয়ন মেট্রিক টন। পরবর্তী কয়েক দশকে প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং ২০১৫ সালে প্লাস্টিক উৎপাদন বেড়ে ৩৮১ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছে যায় (Geyer et al. 2017; Ritchie and Roser, 2018) (Figure 1)।

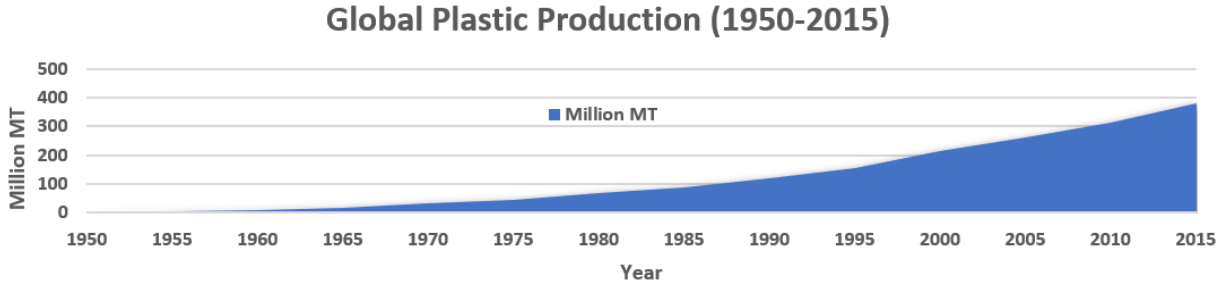

Figure 1: Global plastic production from 1950-2015 (Credit: Ritchie and Roser, 2018; Zaman et al., 2020).

এ পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী প্রায় ৮.৩ বিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদিত হয়েছে; তা থেকে ৭৯% প্লাস্টিক সামগ্রী আবর্জনার সাথে মিশে সরাসরি পরিবেশে যুক্ত হয়েছে (Rhodes, 2018)। এর ফলে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে প্লাটিক একটি মূল সমস্যা হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের জন্য বিপদজনক হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্লাস্টিকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তিত, তবে প্লাস্টিকের প্রভাবে স্বাস্থ্যগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁরা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেননি। এই গবেষণা পত্রে মূলত সমুদ্রের প্লাস্টিক দূষণের বিভিন্ন দিক এবং পরিবেশের উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

পরিবেশে প্লাস্টিকের অবস্থান

প্লাস্টিকের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে পরিবেশে প্লাস্টিক-দূষণ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে এবং এটি বর্তমানে মানব সভ্যতার জন্য একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। Geyer, 2017-এর রিপোর্ট অনুসারে এ পর্যন্ত সমস্ত প্লাস্টিক উৎপাদনের মাত্র ৩০ শতাংশ রিসাইক্লিং বা পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে। আর বেশীর ভাগটিই আবর্জনা হিসেবে পরিবেশে মিশেছে। Rhodes, 2018 রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে ৮.৩ বিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিকের উৎপাদন হয়েছে এবং তা থেকে ১৯৫০ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৬.৩ বিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশে ঢুকেছে, ৯ শতাংশ রিসাইক্লিং হয়েছে, ১২ শতাংশ পোড়ানো (Incinerate) হয়েছে এবং ৭৯ শতাংশ সরাসরি পৃথিবীর পরিবেশে আবর্জনা হিসেবে প্রবেশ করেছে।

বিশ শতকের সত্তরের দশকেই বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিক দুষণের সমস্যার ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে সাবধান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তা যথাযথ গুরুত্বের সাথে মানুষ গ্রহণ করেনি। তবে সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিশ্ববাসী এ সমস্যাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, গত পাঁচ বছরে প্লাস্টিক-দূষণের উপর যে পরিমাণ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, তার পরিমাণ বিগত ৫০ বছরে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের চেয়ে অনেক বেশি (Cirino, 2019)।

এটা এখন প্রতষ্ঠিত সত্য যে, প্লাস্টিকের কারণে সমুদ্র প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। প্লাস্টিক দুষণের মাত্রা এভাবে চলতে থাকলে, প্রতি বছরে ৪.৮ থেকে ১২.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিক সমুদ্রের পানিকে দূষিত করবে। এটি স্বাভাবিক যে, ধনী দেশগুলি এবং অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশগুলি থেকে সমুদ্রের এই প্লাস্টিক দূষণ সবচেয়ে বেশি হারে হচ্ছে। যদিও কিছু কিছু দেশ এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে, তবুও প্লাস্টিক বর্জ্য নদী বা সমুদ্রগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে।

২০১০ সালের ডাটা থেকে দেখা গেছে, চিন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্লাস্টিক উৎপাদন করছে। দেশটি বছরে গড়ে ৫৯.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিক উৎপাদন করে । যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম প্লাস্টিক উৎপাদনকারী দেশ। তারা বছরে উৎপাদন করে ৩৭.৮৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন। প্লাস্টিক উৎপাদনে তিন থেকে দশতম দেশগুলি যথা জার্মানি, ব্রাজিল, জাপান, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, রাশিয়া, তুরষ্ক এবং মিশর (Dorger, 2019)। ২০১৮ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে সাম্প্রতিক প্লাস্টিক-দূষণের ক্ষেত্রে পাঁচটি শীর্ষ স্থানীয় দেশ হলো - চিন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম এবং শ্রীলংকা। সমস্ত পৃথিবীর প্লাস্টিক দূষণের ৫৬ শতাংশই উল্লিখিত এই পাঁচটি দেশ থেকে হয়েছে (Rhodes, 2018)।

সমুদ্রের প্লাস্টিক দূষন

সমুদ্রের প্লাস্টিক দূষণের সমস্যাটি এখন প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। ইংল্যান্ডের UK Government Office for Science থেকে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী সমুদ্রগুলির দূষণের পিছনে ৭০ শতাংশ কারণ এই প্লাস্টিক আবর্জনা (Thompson, 2017)। এই আবর্জনার মূল উৎস সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকাগুলি। কেননা খালি প্লাস্টিক বোতল, বিভিন্ন ধরনের খেলনা, মাছ ধরার যন্ত্রপাতি সহ অন্যান্য প্লাস্টিক উপাদান সমুদ্রের উপকূলগুলির যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। সেখান থেকেই প্লাস্টিকগুলি সমুদ্রের বিভিন্ন অংশে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে (Ritche and Roser, 2018)।

মাছ ধরার পরিত্যক্ত জালগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক পাখি ও সামুদ্রিক প্রাণী আটকা পড়ে। এ সময় প্লাস্টিক খেয়ে ফেলার কারণে প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনাবসান ঘটে। ফলে পরিবেশ ক্রমশই আরো বেশি দূষিত হতে থাকে (Wilcox et al., 2015; Bjorndal et al.1994; Brandao et al., 2011; Browne et al., 2008 and 2011; Choy and Drazen,2013; Davidson and Asch, 2011; Rothstein,1973; Jacobson et al., 2010; Fry et al.1987)। Erikson et al., 2014 এর তথ্য অনুসারে সমুদ্রের পানিতে প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন প্লাস্টিক উপাদান ভাসমান অবস্থায় থাকে; যার ওজন প্রায় ২৫০,০০০ টন। এ বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক দূষণের বিষয়টি বিশ শতকের সত্তরের দশকে সবার নজরে আসতে শুরু করে (Law, 2017), ফলে সমুদ্রের পানি-দূষণ সংক্রান্ত সমস্যাটির প্রত্যক্ষ ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও দ্রুত সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। বস্তুত, সমুদ্রের সব ধরনের এলাকায়ই প্লাস্টিক আবর্জনা পাওয়া গেছে (Choy et al., 2019) যা সমুদ্রের পানি দূষণের বিশাল ব্যাপ্তিকেই প্রমাণ করে।

প্লাস্টিক কিভাবে সমুদ্রে প্রবেশ করে?

ব্যবহৃত প্লাস্টিককে খুব অল্প পরিমাণই রিসাইক্লিং করা হয়। উৎপাদিত প্লাস্টিক সামগ্রীর প্রায় ৫০ শতাংশ মাত্র একবার ব্যবহার করে ডাস্টবিনে ফেলা হয় (Sloactive, 2019), আর আবর্জনার সাথে মিশ্রিত এই প্লাস্টিকের অধিকাংশই ময়লা ফেলার এলাকায় জমা হয় এবং ক্রমশ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য গবেষণা থেকে জানা যায়, শুধু ২০১০ সালেই ২৭৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিক আবর্জনা ১৯২টি সমুদ্র উপকূলীয় দেশে তৈরি হয়েছে; যা থেকে প্রায় ৪.৮-১২.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন সমুদ্রে প্রবেশ করেছে (Jambeck et al., 2015)। Parker, 2016 এর গবেষণায় বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে, ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিক আবর্জনা সমুদ্রে প্রবেশ করবে। ২০১৫ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে ঐ ধরনের অবাছাইকৃত প্লাস্টিকের পরিমাণ ছিল ৬০ থেকে ৯৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন (Lebreton and Andrady, 2019)।

প্লাস্টিক আবর্জনা দ্বারা সমুদ্রের পানি দূষিত হওয়ার শতকরা ২০ ভাগ উপাদান সামুদ্রিক উৎস, যেমন: মাছ ধরার পরিত্যক্ত জাল, মাছ ধরার যন্ত্রপাতির অংশ ও অন্যান্য সামগ্রী থেকে আসে। অবশিষ্ট আশি ভাগের উৎস পৃথিবীর স্থলভাগ। নদীগুলি এই প্লাস্টিক আবর্জনা সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যায় (Sloactive, 2019)। আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতি বৎসর নদীগুলি ১.১৫ থেকে ২.৪১ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিক আবর্জনা সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যায় (Figure 2)।

এই প্লাস্টিক আবর্জনা জনিত দূষণের ৬৭ শতাংশ এশিয়ার বৃহত্তম নদীগুলির মাধ্যমে ঘটে (Leberton, 2017)। এখানে উল্লেখ্য, নদীর পানির প্লাস্টিক আবর্জনার দ্বারা কী পরিমাণ সমুদ্রের পানি দূষিত হয়, তা নির্ণয় করতে হলে প্রথমে নদীর পানির দূষণের পরিমাণ নির্ণয় প্রয়োজন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সমুদ্রে প্লাস্টিক আবর্জনার উৎস নিয়ে যে পরিমাণ গবেষণা হয়েছে, তার তুলনায় প্লাস্টিক আবর্জনা দ্বারা মিঠা পানি কী পরিমাণ দূষিত হয় তার উপর তেমন গবেষণা হয়নি। প্লাস্টিক আবর্জনায় দূষিত নদীগুলির আধিকাংশ এশিয়াতে অবস্থিত হলেও প্লাস্টিক দূষণের উপর যেসব গবেষণা হয়েছে, তার মাত্র ১৪ শতাংশ হয়েছে নদীগুলির দূষণ প্রক্রিয়ার উপর (Blettler et al., 2018)। আমরা মনে করি, পৃথিবীর অধিক দূষিত

নদীগুলির উপর আরো অনেক বেশি গবেষণা হওয়া প্রয়োজন; বিশেষত বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, যেখানে কল-কারখানা দ্রুত বিকশিত হচ্ছে, সমুদ্রের প্লাস্টিক দূষণে তার যথার্থ অবস্থা নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরী। এভাবেই আমরা সুস্থ, সুন্দর, বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে সফল হব।

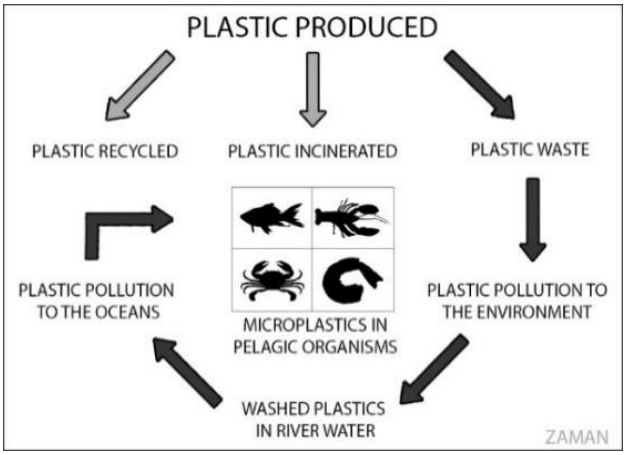

Figure 2: Figure showing how plastics pollute the oceans and bioaccumulate in marine organisms.

সমুদ্রের ঘূর্ণিস্রোত, প্লাস্টিক আবর্জনার স্তূপ ও দি গ্রেট প্যাসিফিক প্যাচ

পৃথিবীর আবর্তন, বাতাসের প্রকৃতি এবং সমুদ্রের চারপাশের স্থলভাগগুলির অবস্থিতির কারণে সমুদ্রে শক্তিশালী ঘূর্ণিস্রোতের (Gyre) উৎপত্তি হয়। এই স্রোতগুলির গভীরতা কয়েকশ মিটার থেকে, কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে (National Geographic, 2019)। উত্তর গোলার্ধে ঘূর্ণিস্রোত গুলি ঘড়ির কাটার গতির দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাটার গতির উল্টো দিকে ঘুরে। ঘূর্ণিস্রোতগুলির কারণে সমুদ্রে সচল কনভেয়ার বেল্টের (Conveyer Belt) উৎপত্তি হয়, যার মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জগুলির গতি সচল থাকে। পাঁচটি শক্তিশালী ঘূর্ণিস্রোতের অবস্থান উত্তর আটলান্টিকে, দক্ষিণ আটলান্টিকে, উত্তর প্যাসিফিকে, দক্ষিণ প্যাসিফিকে এবং ভারত মহাসাগরে (Figure 3A)। এগুলি, The North Pacific Subtropical Gyre, The South Pacific Subtropical Gyre, The North Atlantic Subtropical Gyre, The South Allantic Subtropical Gyre, and The Indian Ocean Subtropical Gyre (NOAA, 2019) নামে পরিচিত। এই বিশাল স্রোতগুলির পাশাপাশি প্যাসিফিক, আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগরে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ঘূর্ণিস্রোত আছে। সমুদ্রে ভাসমান আবর্জনাগুলি সময়ের আবর্তনে ঐ স্রোতগুলির মধ্যে জমতে থাকে এবং ক্রমশ বড় হতে হতে একটা বিশাল স্তূপে পরিণত হয়।

১৯৯৭ সালে ক্যাপ্টেন চার্লস মুর (Charles Moore) সমুদ্রে ভাসমান সবচেয়ে বড় প্লাস্টিক আবর্জনা স্তূপটি আবিষ্কার করেন, যা দি গ্রেট প্যাসিফিক প্যাচ (The Great Pacific Patch) নামে পরিচিত (Parker, 2018)। এই আবর্জনার স্তুপটি ৬০০,০০০ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে অবস্থিত। এটা North-Central Pacific Ocean-এ হাওয়াই এবং কালিফোর্নিয়ার মাঝখানে অবস্থিত (Sharma and Polan, 2018) (Figure 3B)। ধারণা করা হয়, এ স্তূপটিতে ১.৮ ট্রিলিয়ন টুকরা প্লাস্টিক আছে। এর প্রায় অর্ধেক মাছ ধরার জালের প্লাস্টিক

এবং মাছ ধরার যন্ত্রপাতির অংশ; যা সেখানে ক্রমাগত জমা হচ্ছে। অবশিষ্ট অংশটি তৈরি হয়েছে অন্যান্য উৎস থেকে আগত প্লাস্টিক টুকরার সম্মিলনে। গত ৭০ বছর ধরে এই আবর্জনার স্তুপ চক্রবৃদ্ধি হারে বড় হচ্ছে (Sharma and Polan, 2018)। ২০১৫ সালের এক রিপোর্টে বলা হয় দি গ্রেট প্যাসিফিক প্যাচ ১৫-৫১ ট্রিলিয়ন প্লাস্টিক টুকরার স্তূপে পরিণত হতে পারে, যার ওজন হবে প্রায় ৯৩-২৩৬ হাজার মেট্রিক টন (von Sebille et al., 2015)। চিত্রের মাধ্যমে ঘূর্ণিস্রোত (Figure 3A**)** এবং দি গ্রেট প্যাসিফিক প্যাচের (Figure 3B**)** অবস্থান দেখানো হলো**:**

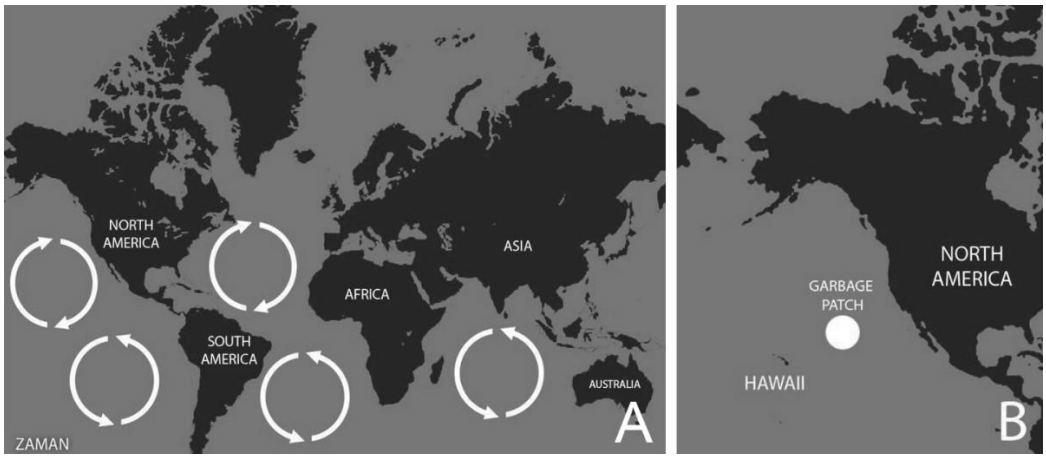

Figure 3: (A) The five major Gyres in the oceans, (B) The Great Pacific Garbage Patch, located between California and Hawaii.

সামুদ্রিক ইকোলজির উপর প্লাস্টিকের প্রভাব

সামুদ্রিক পরিবেশের উপর প্লাস্টিক দূষণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধি এখনো সীমাবদ্ধ। তবে এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, যেহেতু প্লাস্টিক দূষণ সামুদ্রিক প্রাণীদের উপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, স্বভাবতই সামুদ্রিক ইকোলজির উপরও এর ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় (Rothstein, 1973; Boerger, 2010; Murray and Cowie, 2011; Lusher et al., 2012; Vandermeersch et al., 2015; Wilcox et al., 2015; Lamb et al., 2018; Cirino, 2019)।

১৯৭৩ সালে ১৩৫ প্রকার সামুদ্রিক পাখির উপর এক গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় ৯০ শতাংশ পাখিই এই প্লাস্টিক আবর্জনা আহার হিসেবে গ্রহণ করেছে (Rothstein,1973)। এই গবেষণায় আরো বলা হয়, যদি এখনই আমরা সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে যথাযথ উদ্যোগ না নেই, তবে, ২০৫০ সালের মধ্যে পাখিদের নানা সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা ৯৯ শতাংশে পৌঁছাবে (Cirino, 2019; Wilcoxet al., 2015)। ইউনেস্কোর (UNESCO**:** United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) এক গবেষণায় বলা হয়ে, এই প্লাস্টিক দূষণের কারণে প্রায় দশ লক্ষ সামুদ্রিক পাখি এবং এক লক্ষ (১০০,০০০) সামুদ্রিক প্রাণী প্রতি বছর মারা যায় (UNESCO, 2017)। সামুদ্রিক প্রাণী কীভাবে প্লাস্টিক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় চিত্রে তা দেখনো হলো (Figure 4)।

Lamb et al., 2018 এর গবেষণায় বলা হয়েছে, প্লাস্টিক আবর্জনা থেকে নানা ধরণের অণুজীবের উদ্ভব হতে পারে এবং তা থেকে সমুদ্রের নিচের প্রবাল-প্রাচীরে নানা ধরণের রোগের সৃষ্টি হতে পারে এবং এর প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশ থেকে ৮৯ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। এই গবেষণায় আরো বলা হয়, এশিয়া-প্যাসিফিকের প্রবাল প্রাচীরে প্রায় ১১ বিলিয়ন প্লাস্টিক খন্ড রয়েছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যা আরো ৪০ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে।

Figure 4: Plastic pollution affecting the lives of marine creatures (Credit: Getty images, https://www.gettyimages.com/photos/sea-pollution).

প্লাস্টিক একটি ফটোডিগ্রেডেবল (Photodegradable) উপাদান এবং এগুলি পানির লবনাক্ততা ও সূর্য কিরণের কারণে ভেঙে গিয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হয়। এই মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলি আকারে ৫ মিলিমিটারের চেয়ে ছোট (Vandermeersch et al., 2015)।

সমুদ্রে মাইক্রোপ্লাস্টিকের বিস্তারণ নির্ভর করে প্লাস্টিক উপাদানগুলির আকার এবং ঘনত্বের উপর। হালকা উপাদানগুলি সমুদ্রের পানিতে ভাসতে থাকে, অন্যদিকে ভারি উপাদানগুলি সমুদ্রের পানির নিচে তলিয়ে গিয়ে পানির বিভিন্ন স্তরে এবং সমুদ্রের তলদেশে অবস্থান করে। তাছাড়া সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের বায়োএকুমিলেশন (Bioaccumulation) হওয়ার কারণে সমুদ্রের পানির কলামে তাদের পুনর্বিন্যাস ঘটে (Clark et al., 2016)। Monterey Bay pelagic ecosystem-এর উপর একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, উন্মুক্ত সাগরের প্রায় সর্বত্র ২০০ থেকে ৬০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মাইক্রোপ্লাস্টিকের অবস্থান। ধারণা করা হয়, গভীর সমুদ্রের পানির কলাম ও প্রানিকুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাইক্রোপ্লাস্টিক জমা রয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, সামুদ্রিক পরিবেশে অসংখ্য মাইক্রোপ্লাস্টিক ছড়িয়ে আছে এবং তা ধীরে ধীরে বাড়ছে। এই মাইক্রোপ্লাস্টিককে সমুদ্রের বিচ সেডিমেন্ট থেকে শুরু করে ১,১০০ থেকে ৫,০০০ মিটার গভীরতায় সমুদ্রের তলদেশের সেডিমেন্টে শনাক্ত করা হয়েছে (von Cauwenberghe et al., 2013; Qie et al., 2015; Clark et al., 2016)। এমনকি এই মাইক্রোপ্লাস্টিককে মেরুপ্রান্তের বরফের মধ্যেও শনাক্ত করা

হয়েছে (Obba rd et al., 2014)। সমুদ্রের শক্তিশালী ঘূর্ণিস্রোতের (Gyre) মধ্যেও বিশাল পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক জমা আছে (van Sebille et al., 2015)।

মাইক্রোপ্লাস্টিকের বিস্তারণ প্রক্রিয়া এবং মানবদেহে ও অন্যান্য প্রাণীতে তাদের দীর্ঘমেয়াদি বিরূপ ফিজিওলজিক্যাল প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে গবেষণা করে চলেছেন। মাইক্রোপ্লাস্টিক সামুদ্রিক 'ফুড ওয়েব' এর মাধ্যমে সামুদ্রিক প্রাণিকুলের দেহে প্রবেশ করে। সামুদ্রিক প্রাণিরা অনেক সময় ভাসমান মাইক্রোপ্লাস্টিককে জলজ প্ল্যাঙ্কটন মনে করে খেয়ে ফেলে। অনুপ্রবেশকারী মাইক্রোপ্লাস্টিক, সামুদ্রিক প্রাণীর দেহে প্রদাহ (Inflamation), স্বল্প কর্মক্ষমতা বা এনার্জি স্বল্পতা (Low energy), প্রজনন জটিলতা (Reproductive complications) সহ নানা ধরনের সমস্যার সৃস্টি করতে পারে (Wright et al., 2013; Nelms et al., 2015; Wilcox et al., 2015)। বেশ কিছু গবেষণায় মাছ, জুপ্লাঙ্কটন (Zooplankton), মলাস্কস (Mollusks), এবং ক্রাশটাসিয়ান (Crustaceans) এর মধ্যেও মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে (Vandermeersch et al., 2015; Boerger, 2010; Lusher et al., 2012; Murry and Cowie, 2011)। সুতরাং, যেসব অসংখ্য সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণী আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি সেগুলি বানিজ্যিকভাবে বাজারে আসছে এবং মানুষের খাদ্য হিসেবে বিক্রয় হচ্ছে। Seafood-এ মাইক্রোপ্লস্টিকের উপস্থিতি আমাদের স্যাস্থের জন্য কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে, তা নির্নয় করার জন্য এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে পর্যাপ্ত ডাটা নেই (Clark et al., 2016)।

আলোচনা এবং উপসংহার

বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭.৫ বিলিয়ন এবং এই সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। এই অবস্থায় আমরা এই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্লাস্টিক পণ্যের চাহিদাও বাড়বে, এবং এই চাহিদা বৃদ্ধির কারণে প্লাস্টিকের উৎপাদনও বাড়বে। ফলে প্লাস্টিক আবর্জনার পরিমাণও বাড়বে। উপযুক্ত রিসাইক্লিং পদ্ধতির বাস্তবায়ন না হলে এই বিশাল প্লাস্টিক আবর্জনা পরিমাণ বাড়তেই থাকবে এবং স্থল এবং জলজ ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রেও সমস্যা বেড়েই চলবে। বর্তমানে UNEP (United Nations Environmental program) প্লাস্টিক দূষণের এই সমস্যাটিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে এবং এ সম্পর্কে কিছু কর্মসূচিও প্রণয়ন করেছে। এগুলি হলো জনগনকে সচেতন করে তোলা এবং আবর্জনা সমস্যার মোকাবেলা ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি দেশের সরকারকে আরো সক্রিয় করে তোলা (UNEP, 2016)।

প্লাস্টিক আবর্জনার এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও আমরা প্লাস্টিক বিহীন জীবনযাত্রা চিন্তা করতে পারি না। কারণ প্লাস্টিক ব্যবহারের অনেকগুলি ভাল দিকও আছে। যেমন**:** প্লাস্টিকের বহুমুখী ব্যবহার এবং স্বল্প উৎপাদন খরচ, হালকা ওজন এবং নমনীয়তার কারণে প্লাস্টিককে সহজেই বিভিন্ন আকৃতিতে রূপান্তরিত করা যায়। ফলে প্যাকেজিং, ইলেকট্রনিকস, চিকিৎসা যন্ত্রাদি, স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি, এবং প্রাত্যাহিক জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনে প্লাস্টিকের বিপুল চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া প্লাস্টিক উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে কম এনার্জী দরকার হয়, যার কারণে প্রকৃতিতে কার্বনের নির্গমনও কম হয় (UNESCO, 2017)।

প্লাস্টিক দূষণ কমানো অবশ্যই একটি কঠিন কাজ, কিন্তু অসম্ভব নয়। আমাদেরকে প্লাস্টিক সামগ্রীর অপব্যবহারের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে, ব্যবহৃত প্লাস্টিক সামগ্রীর রিসাইক্লিং করতে হবে, এবং

প্লাস্টিকের উৎপাদন কমাতে হবে। এই উদ্যোগটি সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে প্লাস্টিক আবর্জনাকে হ্রাস করা যাবে এবং দূষণকে কমানো যাবে। বর্তমানে নরওয়ে, সুইজারল্যান্ডসহ বেশ কিছু ইউরোপিয়ান দেশে প্রায় ৮০ শতাংশ ব্যবহৃত প্লাস্টিকের রিসাইক্লিং হচ্ছে (UNESCO, 2017); যেখানে সারা বিশ্বে রিসাইক্লিং এর হার মাত্র ৯ শতাংশ (Rhodes, 2018)। এছাড়া কিছু বিকল্প সম্ভাবনার কথাও আমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে, যেমন বায়োডিগ্রেডেবল (Biodegradable) প্যাকিং উপাদান তৈরি করা, যা প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে বায়োপ্লাস্টিক (Bioplastiks) অথবা বায়োডিগ্রেডেবল পলিমারকে (Biodegradable polymers) অন্তর্ভূক্ত করবে (Reddy et al, 2013; Luckachan and Pillai, 2011; Jabeen et al., 2015)। এই প্রক্রিয়া শুরুর পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের অপার্যপ্ত সরবরাহ বা উচ্চ মূল্যের কারণে আমাদের হয়ত বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে উৎপাদন ও সরবরাহ বেড়ে গেলে এই সমস্যাগুলি থেকে আমরা সহজেই বের হয়ে আসতে পারব। এখানে উল্লেখ্য যে সম্প্রতি বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা পাট থেকে একটি ন্যাচারাল ফাইবার কম্পোজিট তৈরী করেছেন। এই বায়োডিগ্রেডেবল কম্পোজিট দিয়ে তৈরী ব্যাগ (সোনালী ব্যাগ) প্লাষ্টিক ব্যাগের পরিবর্তক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে (en.wikipedia, 2023)।

সাম্প্রতিক কালের আরেকটি ঘটনা রিসাইক্লিং এর প্রক্রিয়াটিকে ব্যাহত করছে। গত কয়েক বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশ মিলিয়ন মিলিয়ন টন প্লাস্টিক আবর্জনা চিনের কাছে বিক্রি করছে, রিসাক্লিং এর জন্য। বস্তুত সমস্ত পৃথিবীর ৭০% প্লাস্টিক আবর্জনা চিনে পাঠানো হতো । যদিও এই প্লাস্টিক আবর্জনা রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে চিনের কোম্পানীগুলি বহু মিলিয়ন ডলার অর্থ উপার্জন করছিলো, তবুও চিন সরকার ২০১৮ সাল থেকে এই প্লাস্টিক আবর্জনা আমদানি নিষিদ্ধ করেছে। এই কারণে প্লাস্টিক আবর্জনাগুলি এখন এমন কিছু দেশে পাঠানো হচ্ছে, যারা প্লাস্টিক আবর্জনা রিসাইক্লিং এর জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত নয় বা তারা যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও প্রস্তুত নয় (Joyce, 2019)। প্লাস্টিক আবর্জনার এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রত্যেকটি দেশকে সক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে।

প্লাস্টিক দূষণের কারণে বর্তমানে ভূমি এবং সাগরের ইকোলজির উপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে, তার প্রধান কারণ মানুষের অজ্ঞতা। তাছাড়া পরিবেশের ক্ষেত্রে আমাদের দ্বায়িত্বহীনতা ও জ্ঞানহীন কর্ম-কান্ডও পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমান বিশ্বের পরিবেশের অবনতির জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বেশিরভাগ প্লাস্টিক পণ্যের এককালীন ব্যবহার। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পৃথিবীর সম্পূর্ণ প্লাস্টিক উৎপাদনের প্রায় ৫০ শতাংশ মাত্র একবার ব্যবহার করে ডাস্টবিনে ফেলা হয় (Sloactive, 2019)। উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং তার প্রয়োগের মাধ্যমে এই ভয়াবহ সমস্যাকে আমরা প্রতিহত করতে পারব। ফলে পৃথিবীতে একটি বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি হবে এবং আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি আদর্শ পৃথিবী রেখে যেতে সক্ষম হব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রবন্ধটি লেখকদের প্রকাশিত এবং স্বত্বসংরক্ষিত একটি ইংরেজি প্রবন্ধ (Zaman et al., 2020) থেকে পরিবর্তিত এবং ভাষান্তরিত করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: লেখকবৃন্দ এই প্রবন্ধটি প্রুফরিড করে দেবার জন্য ড. নীলুফা আহসান-কে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

তথ্যসূত্র

ACS. 1993, Leo Hendrick Baekeland and the Invention of Bakelite, Am. Chem. Soc., https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/bakelite.html.

Bjorndal, K.A, Bolten, A.B, Lagueux, C.J. 1994, Ingestion of marine debris by juvenile sea turtles in coastal Florida habitats, Mar. Pollut. Bull., 28: 154-58.

Blettler, M.C.M, Abrial, E, Khan, F.R, Sivri, N, Espinola, L.A. 2018, Freshwater plastic pollution: Recognizing research biases and identifying knowledge gaps, Water Res., 143: 416-424.

Boerger, C.M, Lattin, G.L, Moore, S.L, Moore, C.J. 2010, Plastic ingestion by planktivorous fishes in the North Pacific Central Gyre, Mar. Pollut. Bull., 60: 2275-78.

Brandao, M.L, Braga, K.M, Luque, J.L. 2011, Marine debris ingestion by Magellanic penguins, *Spheniscus magellanicus* (Aves: Sphenisciformes), from the Brazilian coastal zone, Mar. Pollut. Bull., 62: 2246-2249.

Browne, M.A., Crump, P., Niven, S.J., Teuten, E., Tonkin, A., Galloway, T., Thompson, R. 2011, Accumulation of microplastic on shorelines worldwide: sources and sinks, Environ. Sci. Technol., 45: 9175-9179.

Browne, M.A., Dissanayake, A., Galloway, T.S., Lowe, D.M., Thompson R.C. 2008, Ingested microscopic plastic translocate to the circulatory system of the mussel, *Mytilus edulis* (L.), Environ. Sci. Technol., 42: 5026-5031.

Choy, C.A., Drazen, J.C. 2013, Plastic for dinner? Observations of frequent debris ingestion by pelagic predatory fishes from the central North Pacific, Mar. Ecol. Prog. Ser., **485**: 155-163.
Cirino, E. 2019, Plastic Pollution: Could We Have Solved the Problem Nearly 50 Years Ago?, The Revelator, https://therevelator.org/plastic-pollution-warnings/.

Clark, J.R., Cole, M., Lindeque, P.K., Fileman, E., Blackford, J., Lewis, C., Lenton, T.M., Galloway, T.S. 2016, Marine microplastic debris: a targeted plan for understanding and quantifying interactions with marine life, Front. Ecol. Environ., 14 (6): 317–324.

Davison, P., Asch, R.G. 2011, Plastic ingestion by mesopelagic fishes in the North Pacific Subtropical Gyre, Mar. Ecol. Prog. Ser., 432: 173-80.

Dorger, S. 2019, These Countries Produce the Most Plastic Waste, The Street, https://www.thestreet.com/world/countries-most-plastic-waste-14878534.

En.Wikipedia. 2023, Sonali Bag, https://en.wikipedia.org/wiki/Sonali_Bag.

Eriksen, M., Lebreton, L.C.M., Carson, H.S., Thiel, M., Moore, C.J., Borerro, J.C, et.al. 2014, Plastic Pollution in the World's Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea, PLoS One 9 (12): e111913, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0111913.

Fry, D.M., Fefer, S.I., Sileo, L. 1987, Ingestion of plastic debris by Laysan albatrosses and wedge-tailed shearwaters in the Hawaiian Islands, Mar. Pollut. Bull., 18: 339-43.

Geyer, R., Jambeck, J.R., Law, K.L. 2017, Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made, Sci. Adv., **3** (7) (doi: 10.1126/sciadv.1700782).

Jabeen, N., Majid, I., Nayik, G.A. 2015, Bioplastics and food packaging: A review, Cogent. Food Agri. 1 (1), https://doi.org/10.1080/23311932.2015.1117749).

Jacobsen, J.K., Massey, L., Gulland, F. 2010, Fatal ingestion of floating net debris by two sperm whales (*Physeter macrocephalus*), Mar. Pollut. Bull., 60: 765-67.

Jambeck, J.R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T.R., Perryman, M., Andrady, A., et. al. 2015, Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, 347: 768-771.

Joyce, C. 2019, Where will your plastic trash go now that China doesn't want it?, https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/03/13/702501726/where-will-your-plastic-trash-go-now-that-china-doesnt-want-it.

Knight, L. 2014, A brief history of plastics, natural and synthetic, British Broadcasting Corporation News, https://www.bbc.com/news/magazine-27442625.

Lamb, J.B., Willis, B.L., Fiorenza, E.A., Couch, C.S., Howard, R., Rader, D.N., et al. 2018, Plastic waste associated with disease on coral reefs, Science, 359: 460-462.

Law, K.L. 2017, Plastica in the Marine Environment, Annl. Rev. Mar. Sci., 9: 205-229.

Lebreton, L., Zwet, J., Damsteeg, J., Slat, B., Andrady, A., Reisser, J. 2017, River plastic emissions to the world's oceans, Nature Comm., 8: 15611.

Luckachan, G.E., Pillai, C.K.S. 2011, Biodegradable Polymers- A Review on Recent Trends and Emerging Perspectives, J. Polymer Environ., 19 (3): 637-676.

Lusher, A., McHugh, M., Thompson, R. 2012, Occurrence of microplastics in the gastrointestinal tract of pelagic and demersal fish from the English Channel, Mar. Pollut. Bull., 67: 94–99.

Murray, F., Cowie, P.R. 2011, Plastic contamination in the decapod crustacean Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758), Mar. Pollut. Bull. 62: 1207-1217.

National Geographic. 2019, Ocean Gyres, https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ocean-gyre/.

Nelms, S.E., Duncan, E.M., Broderick, A.C., Galloway, T.S., Godfrey, M.H., Hamann, M. 2015, Plastic and marine turtles: A review and call for research, ICES J. Mar. Sci., 73: 165–81.

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 2019, What is a gyre?, https://oceanservice.noaa.gov/facts/gyre.html.

Obbard, R.W., Sadri, S., Wong, Y.Q., Khitun, A.A., Baker, I., Thompson, R.C. 2014, Global warming releases microplastic legacy frozen in Artic Sea ice, Earth's Future, 2: 315-320.

Parker, L. 2016, Eight Million Tons of Plastic Dumped in Oceans Every Year, Nation. Geo., https://news.nationalgeographic.com/news/2015/02/150212-ocean-debris-plastic-garbage-patches-science/.

Parker, L. 2018, The Great Pacific Garbage Patch Isn't What You Think It Is, National Geographic, https://news.nationalgeographic.com/2018/03/great-pacific-garbage-patch-plastics-environment/.

Qie, Q., Peng, J., Yu, X., Chen, F., Wang, J., Dong, F. 2015, Occurrence of microplastics in the coastal marine environment: First observation on sediment of China, Marine Pollut. Bull., 98: 274-280.

Reddy, R.L., Reddy, V.S., Gupta. G.A. 2013, Study of Bioplastics as Green and Sustainable Alternative to Plastics, Int. J. Emerg. Technol. Adv. Eng., 3 (5): 82-89.

Rhodes, C.J, 2018. Plastic Pollution and Potential Solution, Sci. Prog., 101 (3): 207-260.

Rictchie, H., Roser, M. 2018, Plastic pollution, Our World in Data, https://ourworldindata.org/plastic-pollution.

Rothstein, S.I. 1973, Plastic particle pollution of the surface of the Atlantic Ocean: evidence from a seabird, Condor, 75: 344-366.

Sharma, U., Polan, S. 2018, This incredible animation shows what 80,000 tons of garbage in the ocean looks like, Business Insider, https://www.businessinsider.com.au/how-big-is-great-pacific-garbage-patch-2018-10.

Sloactive, 2019. Plastic Pollution, https://sloactive.com/plastic-pollution/.

Thompson R.C. 2017. Future of the Sea: Plastic Pollution. Foresight – Government Office for Science (UK), https://www.gov.uk/government/publications/future-of-the-sea-plastic-pollution.

UNEP (The United Nations Environment Program). 2016, Frontiers 2016: Emerging issues of environmental concern, https://www.unenvironment.org/resources/frontiers-2016-emerging-issues-environmental-concern.

UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 2017, Facts and figures on marine pollution, http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/focus-areas/rio-20-ocean/blueprint-for-the-future-we-want/marine-pollution/facts-and-figures-on-marine-pollution/.

Vandermeersch, G., Van Cauwenberghe, L., Janssen, C.R., Marques, A., Granby. K., Fait, G. 2015, A critical view on microplastic quantification in aquatic organisms, Environ. Res., 143: 46-55.
van Sebille, E., Wilcox, C., Lebreton, L., Maximenko, N., Hardesty, B.D., van Franeker, J.A. 2015, A global inventory of small floating plastic debris, Environ. Res. Lett., 10 (12): 124006.

Von Cauwenberghe, L., Vanreusel, A., Mees, J., Janssen, C.R. 2013, Microplastic pollution in deep-sea sediments, Environ. Pollut., 182: 495-499.

Wilcox, C.W., Sebilleb, E.V., Hardestya, B.D. 2015, Threat of plastic pollution to seabirds is global, pervasive, and increasing, Proc. Nat. Acad. Sci., https://www.pnas.org/content/early/2015/08/27/1502108112.

Wright, S.L., Rowe, D., Thompson, R.C., Galloway, T.S. 2013, Microplastic ingestion decreases energy reserves in marine worms, Curr. Biol., 23: 1031-33.

Zaman, M.S., Zaman, R., Sizemore, R.C. 2020, Plastic Pollution of the Oceans: A Review of Marine Plastic Pollution and Its Environmental Impacts, Adv. Sci. Tech., 13: 1-8.

ORIGINAL ARTICLE

The Prospect of SMR Technology in the Remote Areas of Bangladesh for Nuclear Electricity Production

A.F.M. Mizanur Rahman[1], Shanjib Karmaker[1], K.M. Jalal Uddin Rumi[1], Rahnuma Siddique[1], Farhana Islam[1], Md. Rubel Ali Biswash[2], Md. Abdur Razzaque[1], Abid Imtiaz[3,*]

[1]Construction of Rooppur Nuclear Power Plant Project, Bangladesh Atomic Energy Commission, Bangladesh; [2]Atomic Energy Centre, Bangladesh Atomic Energy Commission, Bangladesh; [3]Nuclear Safety, Security and Safeguards Division, Bangladesh Atomic Energy Commission, Bangladesh

**Corresponding Author: Abid Imtiaz,*
Corresponding Email: dr.abidz@gmail.com

Received: 8/27/2023 / Accepted: 10/9/2023

https://doi.org/10.5281/zenodo.10157402

ABSTRACT

Small Modular Reactor (SMR) is an environment-friendly, safe, affordable, and sustainable technology for the production of nuclear electricity alongside large conventional Nuclear Power Plant (NPP)>300 MW(e). In recent years, the potential application of SMR technology has been at the center of interest around the world. In this respect, research and development are being carried out on the concept and design of an SMR for the production of nuclear electricity. As it is smaller in size ≤300 MW(e), the construction area, expenses, time for the completion and regulatory obligations are comparatively less than the existing Nuclear Power Plant >300 MW(e). Moreover, the lifetime of an SMR is much longer than that of a conventional power plant. As a part of the Power System Master Plan (PSMP)-2016 of Bangladesh, the construction of two units of NPP at Rooppur, with a capacity of 1200 MWe each, is at the final stage. In addition to the construction of conventional power plants, the government has a plan to establish new Nuclear Power Plants under the Power System Master Plan, particularly in the remote areas of the southern part of Bangladesh. In anticipation of sustainable development and elimination of differences in regional development in Bangladesh, the remote areas where transmission lines and grid-capacities are inadequate for large power plants, instead of constructing the conventional short-lived, large power plant, construction of SMR can be considered as an effective and viable option for supplying electricity to industry, business, and private homes.

Keywords: NPP, SMR, conventional power plant, remote areas

Cite this article as: *Rahman, A.F.M.M., Karmaker, S., Rumi, K.M.J.U., Siddique, R., Islam, S., Biswash, M.R.A., Razzaque, M.A., Imtiaz, A. 2023, Prospect of SMR Technology in the Remote Areas of Bangladesh for Nuclear Electricity Production, Bangla J. Interdisciplinary Sci., 1 (2); 15-28.*

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে এসএমআর প্রযুক্তির সম্ভাবনা

সারাংশ

স্মল মডিউলার রিয়্যাক্টর (এসএমআর) প্রচলিত বৃহৎ আকারের >৩০০ MW (e) পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ন্যায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশ-বান্ধব, নিরাপদ, টেকশই ও সাশ্রয়ী। বিগত বছরগুলোতে এসএমআর প্রযুক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার পৃথিবীব্যাপী পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদদের কৌতুহলের কেন্দ্রে আবর্তিত হচ্ছে। এই আলোকে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এসএমআর-এর কনসেপ্ট ও ডিজাইনের উপর বিস্তর গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড চলছে। এসএমআর আকারে ছোট <৩০০ MW (e) হওয়ায় তা স্থাপনের জন্য জায়গা, খরচ ও সময় এবং রেগুলেটরি বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের >৩০০ MW (e) চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। উপরন্তু, এসএমআর-এর লাইফ-টাইম প্রচলিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশী। বাংলাদেশের Power System Master Plan (PSMP)-২০১৬-এর অংশ হিসেবে রূপপুরে ১২০০ MW (e) ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি পারমাণবিক চুল্লীর নির্মাণ কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উপরন্তু, প্রচলিত বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি সরকার PSMP-২০১৬-এর আধীনে নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। বাংলাদেশের প্রত্যাশিত টেকশই উন্নয়নে ও আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য দূরীকরণে, যে সকল প্রত্যন্ত অঞ্চলে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপযোগী পর্যাপ্ত ট্রান্সমিশন লাইন ও গ্রিড-সক্ষমতা নেই, সেখানে প্রচলিত স্বল্পমেয়াদী, বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিবর্তে এসএমআর স্থাপন শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও ঘর-বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহের একটি ফলপ্রসু পন্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মূল শব্দগুলি: এনপিপি, এসএমআর, প্রচলিত বিদ্যুৎকেন্দ্র, প্রত্যন্ত অঞ্চল

ভূমিকা

উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য এসঅএমআর একটি বিশাল সম্ভবনাময় প্রযুক্তি। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সেকটরগুলির উন্নয়নের জন্য এই প্রযুক্তি অত্যন্ত সফল ও লাগসই মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে; যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি, প্রতিটি অর্থনৈতিক সেক্টরের গুণগত মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানির ক্ষেত্রসমূহের সম্প্রসারণ, শহরের উন্নয়নের সাথে সাথে গ্রামকেন্দ্রীক উন্নয়ন এবং দেশের অঞ্চলভেদে উন্নয়ন

বৈষম্য দূরিকরণ ও অঞ্চলভেদে সুষম ও টেকসই উন্নয়ন, ইত্যাদি। এজন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। বর্তমানে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বিদ্যুতের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ফলে, লোড শেডিং এর ন্যায় অনকাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিঘ্নিত হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক প্রযুক্তি একটি পরিবেশ বান্ধব, সাশ্রয়ী, টেকশই ও নিরাপদ প্রযুক্তি হিসাবে বিশ্বব্যাপী বিবেচিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বেজ লোড (Base load) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে পারমাণবিক প্রযুক্তিকে পিএসএমপি-২০১৬ তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইতোপূর্বে গৃহীত সকল পরিকল্পনায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পিএসএমপি - ২০১৬ অনুযায়ী, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আগামী ২০২৪ - ২০২৫ সাল নাগাদ দুটি ইউনিট (প্রতিটি ১২০০ মেগাওয়াট), ২০৩০ - ২০৩১ সালে আরো দুটি ইউনিট এবং ২০৪০ - ২০৪১ সালে আরো দুটি ইউনিট হতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে (PSMP 2016)। পিএসএমপি - ২০১৬-তে পারমাণবিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে ৭%, যা উল্লিখিত পারমাণবিক চুল্লিগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে অর্জিত হবে। উল্লেখ্য যে, পারমাণবিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উপরন্তু, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান, যার আওতায় প্রস্তাবিত সাইটসমূহে সাইট সিলেকশন পর্যায়ের সিসমোলজিক্যাল ও টেকটনিক্যাল, ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক এবং গ্রাউন্ড ও সারফেস ওয়াটার হাইড্রোলজিক্যাল স্ট্যাডি করা হয়েছে (BAEC, 2021)। এ ছাড়াও উক্ত সাইটসমুহ 'একটিভ ডেল্টা বেসিন'-এর মধ্যে পড়েছে কিনা; উৎপাদিত বিদ্যুতের চাহিদা, ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন; ভারি যন্ত্রপাতি পরিবহন ব্যবস্থা; অর্থনৈতিক সমীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য স্ট্যাডি সম্পন্ন করা হবে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাইট নির্বাচনের বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মানুষ ও পরিবেশের নিরাপত্তা ও সেই সাথে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও নির্মাণ ব্যয়, ইত্যাদি সাইট সিলেকশান-এর উপর নির্ভরশীল। সেজন্য সাইট নির্বাচনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) নির্দেশনার পাশাপাশি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের আইন ও বিধি-বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলতে হয়। তবে প্রচলিত বৃহৎ আকারের (≤১০০০ মেগাওয়াট) পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের তুলনায় ছোট আকারের 'স্মল মডিউলার রিয়্যাক্টর'-এর সাইট সিলেকশান ক্রাইটেরিয়া ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলি তুলনামূলক কম এবং স্বল্পায়াসে প্রতিপালনযোগ্য। যে সকল জায়গায় বৃহৎ আকারের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ সম্ভব নয়, সে সকল জায়গায় এসএমআর স্থাপন করা সম্ভব। বিশেষ করে, সাগরের তীরবর্তী স্থান, যেখানে মাটির গুণগত কারণে বড় আকারের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব না, সেখানেও এসএমআর স্থাপন করা সম্ভব। এসএমআর-এর বিশেষ সুবিধা হলো এটি স্বল্পতর সময়ে কারখানায় তৈরি করে কাঙ্ক্ষিত স্থানে স্থাপন করা যায়। পরবর্তী

অধ্যায়ে এসএমআর-এর বিশেষ দিকসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা এবং সেই সাথে বাংলাদেশে এটি স্থাপনের সম্ভাবনার দিকগুলো আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতের পরিসংখ্যান

বর্তমানে বাংলাদেশে স্থাপিত ১৫২ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,৯১১ মেগাওয়াট (BUBO, 2023)। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সংযুক্ত হয় তাকে ৪ টি খাতে ভাগ করা যায়। খাতগুলো হলো- সরকারি খাত, যৌথ উদ্যোগ, বেসরকারি ও আমদানি খাত । সরকারি খাতে রাষ্ট্রায়াত্ব ৬টি প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রে সর্বমোট ১০,৪৭৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, যা মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৪২ শতাংশ। যৌথ উদ্যোগ (সরকারি-বেসরকারি) খাতে ২টি প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রে সর্বমোট ১,৮৬১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, যা মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৭ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ৬ টি প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রে সর্বমোট ৯,৯১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, যা মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৪০ শতাংশ। আমদানি খাতে মূলত ভারত থেকে High Voltage Direct Current (HVDC) ভেড়ামারা ও ত্রিপুরা হয়ে বিদ্যুৎ আমদানি করা হয়। আমদানির মাধ্যমে সর্বমোট ২,৬৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়, যা মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০ শতাংশ। স্থাপিত ১৫২ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে ৬৪ টি প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১১,৪৭৯ মেগাওয়াট, যা মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৪৬ শতাংশ; ৬৫ টি ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৬,৪৯২ মেগাওয়াট, যা মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ২৬ শতাংশ; ৫টি কয়লা, ৭টি ডিজেল, ১টি হাইড্রো ও ১০টি অন-গ্রিড সৌর ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মোট উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ২৬৯২ মেগাওয়াট, ১০১০ মেগাওয়াট, ২৩০ মেগাওয়াট ও ৪৫৯ মেগাওয়াট; যা মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের যথাক্রমে ১১ শতাংশ, ০৪ শতাংশ, ০১ শতাংশ ও ০২ শতাংশ। নিচের টেবিল- ১, ২ ও ৩ এ বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো (BUBO, 2023)। উল্লেখ্য যে, দেশের বিদ্যুৎ সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য Quick Rental Power Plant (QRPP) স্বল্প মেয়াদে বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ চালু করা হয় কিন্তু বর্তমানে অনেকগুলো নতুন নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হওয়ায় QRPP এর গুরুত্ব কমে এসেছে।

টেবিল ১: গ্রিডভিত্তিক বর্তমান স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (খাত অনুযায়ী) (BUBO, 2023)

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মে.ও.)
সরকারি খাত		
বিপিডিবি	৩৯	৬,২৩৩
এপিএসসিএল	৫	১,৩৯৪
ইজিসিবি	৩	৯৫৭
নওপাজেকো	৭	১,৪০১
আরপিসিএল	৩	১৮২
বি-আর পাওয়ার জোন	২	৩১২

উপ-মোট (সরকারি খাত)	**৫৯**	**১০,৪৭৯ (৪২%)**
যৌথ উদ্যোগ		
বিসিপিসিএল	১	১,২৪৪
বিআইএফপিসিএল	১	৬১৭
উপ-মোট (যৌথ উদ্যোগ)	**২**	**১,৮৬১ (৭%)**
বেসরকারি খাত		
আইপিপি	৬২	৮,৪৯৪
এসআইপিপি(বিপিডিবি)	৪	৯৯
এসআইপিপি(আরইবি)	৯	২৫১
ভাড়াভিত্তিক (১৫ বছর)	৪	১৬৯
ভাড়াভিত্তিক (৩/৫ বছর)	২	১০৫
ভাড়াভিত্তিক (নো ইলেকট্রিসিটি নো পেমেন্ট)	**১০**	**৭৯৭**
উপ-মোট (বেসরকারি খাত)	**৯১**	**৯,৯১৫ (৪০%)**
বিদ্যুৎ আমদানি		
ভেড়ামারা এইচভিডিসি		১,০০০
ত্রিপুরা		১৬০
ঝাড়খন্ড (ভারত) (আদানী পাওয়ার)		১,৪৯৬
উপ-মোট (বিদ্যুৎ আমদানি)		**২,৬৫৬ (১১%)**
মোট	**১৫২**	**২৪,৯১১**

টেবিল ২: গ্রিডভিত্তিক বর্তমান স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জ্বালানি অনুযায়ি) (BUBO, 2023)

ক্রঃ নং	**জ্বালানী**	**বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা**	**স্থাপিত ক্ষমতা (মে.ও.)**	**শতকরা হার**
১	প্রাকৃতিক গ্যাস	৬৪	১১,৪৭৯	৪৬%
২	ফার্নেস অয়েল	৬৫	৬,৪৯২	২৬%
৩	ডিজেল	৭	১,০১০	৪%
৪	কয়লা	৫	২,৬৯২	১১%
৫	হাইড্রো	১	২৩০	১%
৬	অন-গ্রিড সৌর	১০	৪৫৯	২%
৭	বিদ্যুৎ আমদানি	-	২,৬৫৬	১০%
মোট		**১৫২**	**২৪,৯১১**	**১০০%**

টেবিল ৩: বাংলাদেশের Quick Rental Power Plant (QRPP) সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি (২০০৯-২০২৩) (BUBO, 2023)

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎকেন্দ্রের নাম	জ্বালানী	স্থাপিত ক্ষমতা (মে.ও.)
১	ঘোড়াশাল, নরসিংদী	ডিজেল	১৪৫
২	পাগলা কুইক রেন্টাল	ডিজেল	৫০
৩	বি-বাড়িয়া	গ্যাস	৭০
৪	আশুগঞ্জ	গ্যাস	১৩৩
৫	মদনগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ	HFO	১০২
৬	মেঘনাঘাট, নারায়নগঞ্জ	HFO	১০০
৭	সিদ্ধীরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ	ডিজেল	১০০
৮	সিদ্ধীরগঞ্জ	HFO	১০০
৯	ঘোড়াশাল	গ্যাস	৭৮
১০	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	HFO	১০০
১১	নোয়াপাড়া, যশোর	HFO	৪০
১২	খুলনা	ডিজেল	৫৫
১৩	খুলনা	HFO	১১৫
১৪	আমনুরা, চাপাই নবাবগঞ্জ	HFO	৫০
১৫	কাটাখালী, রাজশাহী	HFO	৫০
১৬	জুলদা, চট্টগ্রাম	HFO	১০০
	মোট		**১৪৮৮**

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হলো পরমাণু প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে কার্বন নির্গমন-মুক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশ্বব্যাপি পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও টেকশই পন্থা। পারমাণবিক প্রযুক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অন্য প্রযুক্তির তুলনায় ক্যজুয়ালিটির হার সর্বনিম্ন। পারমাণবিক প্রযুক্তিতে সংঘঠিত নিউক্লিয়ার ফিশন ও নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি পাওয়া যায়। বর্তমানে পারমাণবিক প্রযুক্তি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের সিংহভাগই পরমাণু চুল্লিতে ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বিভাজনের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন এখনো সম্ভব না হলেও বিশ্বে এর উপর ব্যাপক গবেষণা চলমান এবং অদূর ভবিষ্যতে ফিউশন রিএ্যক্টরের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী। বর্তমানে বিশ্বের ৩২টি দেশে ৪৩৭ টি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চলোমান আছে এবং এগুলো থেকে প্রায় ৩৮৯৫০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশসহ ১৯ টি দেশে ৫৬ পারমাণবিক বিদ্যুৎ

কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। এগুলো চালু হলে প্রায় ৫৮০৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। এ সংক্রান্ত তথ্য চিত্র-১ ও ২ এ দেয়া হলো (IAEA, 2013; IAEA, 2023)

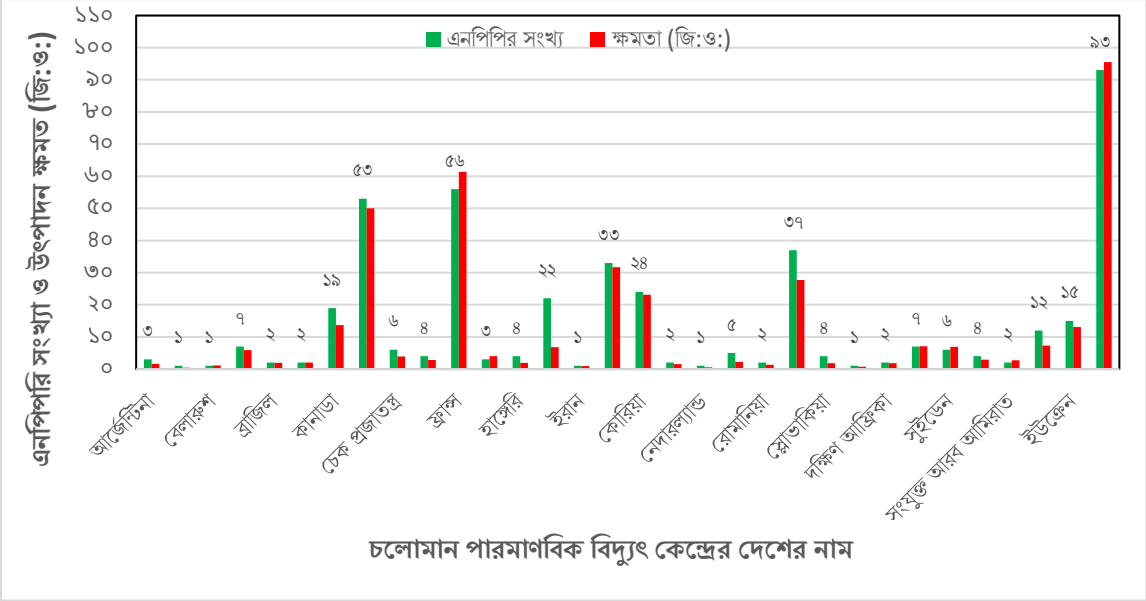

চিত্র ১: বিভিন্ন দেশে চলোমান পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা (জি.ও.)।

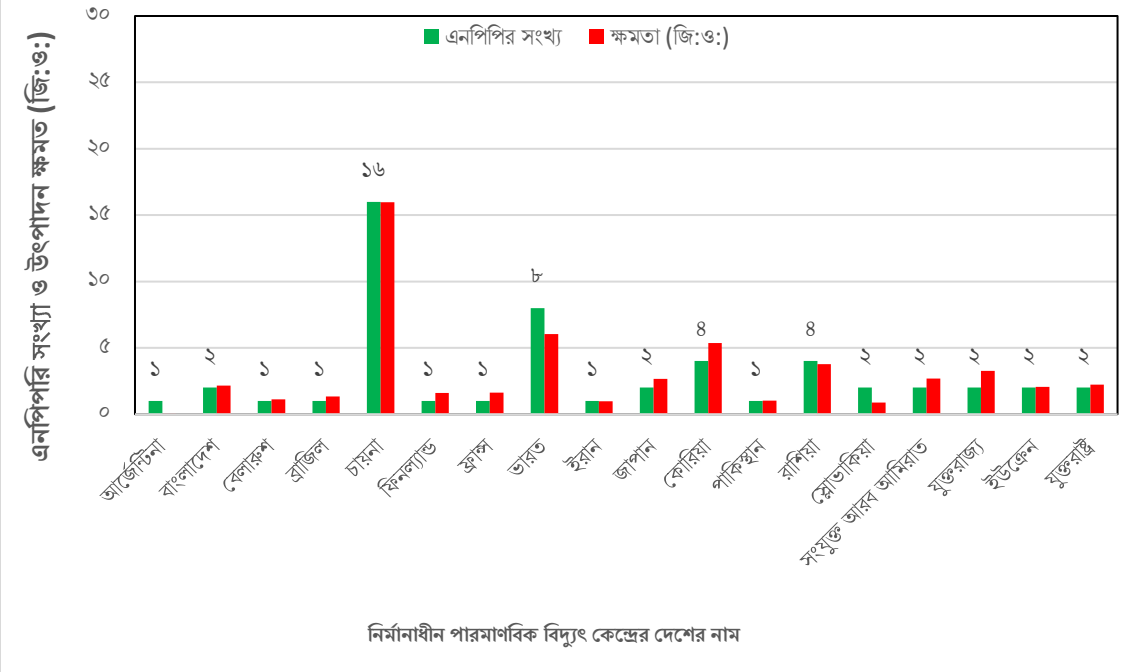

চিত্র ২: বিভিন্ন দেশে নির্মানাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা (জি.ও.)।

স্মল মডিউলার রিঅ্যাক্টর (এসএমআর)-এর বর্ণনা

এসএমআর হলো উন্নত প্রযুক্তির ছোট আকৃতির পারমাণবিক চুল্লি যার বর্তমান ডিজাইন মোতাবেক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সর্বোচ্চ ৩০০ মেগাওয়াট। এসএমআর-এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রচলিত বড় আকারের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের তুলনায় কম। তবে প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে পরবর্তীতে এসএমআর-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে। এটি স্বল্প-কার্বন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। নির্গমন-মুক্ত শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে তারা সৌর এবং বায়ু শক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলির সাথে অনন্যভাবে যুক্ত হয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম। এটি কার্বন-মুক্ত ভবিষ্যতকে বাস্তবসম্মত, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ি করে তোলে। এটা স্থাপনের জন্য তুলনামূলক ছোট জায়গা প্রয়োজন হয়, তাই যেসব স্থান বড় রিঅ্যাক্টর স্থাপনের অনুপযুক্ত বা যেসব এলাকায় বড় রিঅ্যাক্টরের প্রয়োজন হয় না, সেখানে এসএমআর স্থাপন করা যায়। সহজ ও সুন্দরভাবে এটি সম্পর্কে আরো বলা যায়: ছোট-আকৃতিতে একটি প্রচলিত বড় আকারের পারমাণবিক চুল্লির তুলনায় অনেক ছোট; মডুলার- একটি ইউনিট হিসেবে কারখানায় তৈরি ও ব্যবহার উপযোগী করে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনযোগ্য এবং রিঅ্যাক্টর- যেখানে পারমাণবিক ফিশন প্রক্রিয়ায় তাপশক্তি উৎপাদিত হয়, যা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। চলমান চাহিদা কিংবা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য এসএমআর-এর আকার ভিন্ন ভিন্ন হয়। বড় আকারের বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা এবং পরিবেশগত পারমাণবিক নিরাপত্তাজনিত বাধ্যবাধকতা সহজীকরণের লক্ষ্যে এসএমআর ডিজাইন করা হয়েছে।

এসএমআর এর মূখ্য উপাদানসমূহ

কন্টেনমেন্ট: চুল্লি এবং সংশ্লিষ্ট বাষ্প জেনারেটরের চারপাশের কাঠামো যা এটিকে বাইরের অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ভিতরে কোনও গুরুতর ত্রুটির ক্ষেত্রে বিকিরণের প্রভাব থেকে বাইরের মানুষ ও পরিবেশ রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়। এটি সাধারণত একটি পুরু কংক্রিট এবং ইস্পাত কাঠামো।

প্রেসার ভেসেল বা প্রেসার টিউব: সাধারণত রিঅ্যাক্টর কোর এবং মডারেটর/কুল্যান্ট সমন্বিত একটি শক্তিশালি ইস্পাত কাঠামো। এটি জ্বালানি ধারণ করে এবং আশেপাশের মডারেটরের মাধ্যমে কুল্যান্টকে বহনকারি টিউবের একটি সিরিজ হতে পারে।

রিঅ্যাক্টর কোর: এটি চুল্লির মূল অংশ। এখানে পারমাণবিক জ্বালানি থাকে এবং পারমাণবিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন হয়।

জ্বালানি দণ্ড: এতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ জ্বালানি উপাদানের পেলেটগুলো টিউবে সাজানো থাকে।

কন্ট্রোল রড: এগুলি ক্যাডমিয়াম, হাফনিয়াম বা বোরনের মতো নিউট্রন-শোষণকারি উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয় এবং রিঅ্যাক্টর কোর এ বিক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করতে বা রিঅ্যাক্টর বন্ধ করার জন্য ঢোকানো বা প্রত্যাহার করা হয়।

শীতলীকারক: এটি একটি নির্দিষ্ট তরল যা রিঅ্যাক্টর কোর এর তাপ স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মডারেটর: এটি রিঅ্যাক্টর কোরের একটি উপাদান যা ফিশন বিক্রিয়া থেকে নিঃসৃত নিউট্রনকে ধীর করে দেয় যাতে তারা আরও ফিশন বিক্রিয়া ঘটায়। এটি সাধারণত জল, ভারি জল বা গ্রাফাইট হতে পারে।

বাষ্প জেনারেটর: এটি প্রেসারাইজড ওয়াটার রিঅ্যাক্টর এর কুলিং সিস্টেমের অংশ যেখানে চুল্লি থেকে তাপ নিয়ে আসা উচ্চ-চাপের প্রাথমিক কুল্যান্ট একটি সেকেন্ডারি সার্কিটে টারবাইনের জন্য বাষ্প তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। মূলত একটি মোটর কার রেডিয়েটারের মতো একটি হিট এক্সচেঞ্জার।

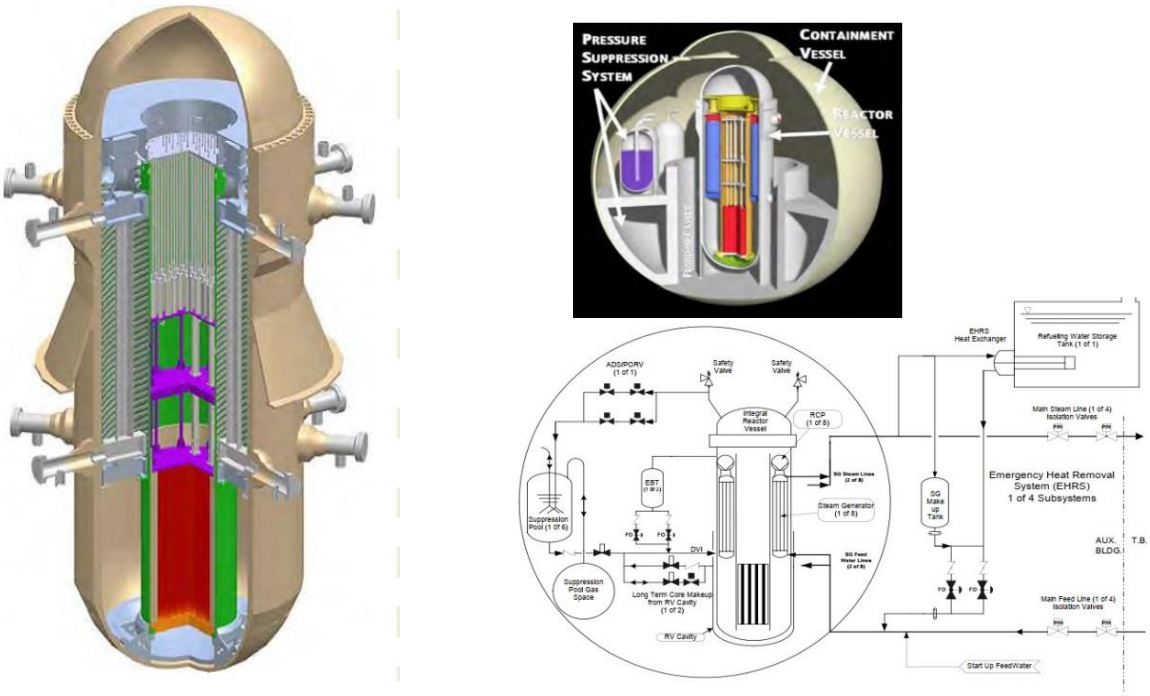

চিত্র ৩: IRIS (IRIS International Consortium) কর্তৃক ডিজাইকৃত এসএমআর-এর নকশা।

এসএমআর-এর বিশেষ সুবিধাসমূহ

১. প্রচলিত পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় এসএমআর ডিজাইন সাধারণত সহজ ও আকারে বেশ ছোট।

২. এসএমআর-এর ডিজাইন খুবই নমনীয়। শক্তির চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে ডিজাইন করার সুযোগ থাকে।

৩. নির্মাণ খরচ ও স্থাপনের জন্য প্রয়োজনী জায়গা প্রচলিত পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় অনেক কম।

৪. এসএমআর-এর অংশগুলি কারখানায় তৈরি করে সাইটের অবস্থানে পাঠানো যায় তাই নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ হয়।

৫. যে এলাকায় পর্যাপ্ত ট্রান্সমিশন লাইন এবং গ্রিড ক্ষমতা নেই, সেখানে একটি বিদ্যমান গ্রিডে বা দূরবর্তীভাবে অফ-গ্রিডে এটি ছোট বৈদ্যুতিক আউটপুটের ফাংশন হিসেবে, শিল্প-কারখানায় এবং আবাসিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ইনস্টল করা যায়।

৬. প্রচলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় শীতলীকরণের জন্য কম পানির প্রয়োজন হয়। তাই, স্বল্প পানির প্রাপ্যতার স্থানসমূহেও এসএমআর স্থাপন করা যায়।

৭. এলাকার বিদ্যুৎ চাহিদার উপর ভিত্তি করে এসএমআর-এর কাস্টম ডিজাইন করা যায়।

৮. প্রচলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের তুলনায় এসএমআর এর তাপ-দক্ষতা বেশি।

৯. নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম জনবল প্রয়োজন।

১০. এসএমআর-এর নিরাপত্তার ধারণা অনেকাংশে পরোক্ষ সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং চুল্লির অন্তর্নিহিত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, যেমন কম শক্তি এবং অপারেটিং চাপ। এর মানে হলো যে এই ধরনের ক্ষেত্রে সিস্টেমগুলিকে বন্ধ করার জন্য কোনও মানুষের হস্তক্ষেপ বা বাহ্যিক শক্তি বা শক্তির প্রয়োজন হয় না। কারণ প্যাসিভ সিস্টেমগুলি প্রাকৃতিক সঞ্চালন, পরিচলন, মাধ্যাকর্ষণ এবং স্ব-চাপের মতো শারীরিক ঘটনাগুলির উপর নির্ভর করে। এই বর্ধিত নিরাপত্তা মার্জিন, কিছু ক্ষেত্রে, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পরিবেশ এবং জনসাধারণের জন্য তেজস্ক্রিয়তার অনিরাপদ প্রকাশের সম্ভাবনাকে দূর করে বা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়।

১১. এসএমআর-এ স্বল্প পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন হয়। এসএমআর-এ কম সংখ্যকবার জ্বালানি প্রতিস্থাপন করতে হয়, প্রতি ৩-৭ বছরে একবার। যেখানে প্রচলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি ১-২ বছরে জ্বালানি প্রতিস্থাপন করতে হয়। কোন কোন এসএমআর এমনভাবে ডিজাইন করা হয়, যা জ্বালানি প্রতিস্থাপন ছাড়াই ৩০ বছর পর্যন্ত চালানো যায়।

১২. এসএমআর-এ যৎসামান্য পারমাণবিক বর্জ্য তৈরি হয়, যার ব্যবস্থাপনা তুলনামুলকভাবে সহজসাধ্য।

বর্তমানে বিশ্বে ১৫ টি দেশ বিভিন্ন চাহিদার উপর ভিত্তি করে ০৬ ধরনের মোট ৭২ টি মডেলের এসএমআর ডিজাইন করেছে। এর মধ্যে ২৫ টি Land-based water-cooled এসএমআর; ৬টি Marine-based water-cooled এসএমআর; ১৪টি High Temperature Gas Cooled এসএমআর; ১১টি Fast Neutron Spectrum এসএমআর, ১০টি Molten Salt এসএমআর; এবং ৬ টি Micro-sized এসএমআর। এদের মধ্যে শুধুমাত্র রাশিয়ার KLT-40S, চায়নার HTR-10 ও জাপানের HTTR-30 মডেলের এসএমআর গুলো বিদ্যুৎ উৎপাদন পর্যায়ে রয়েছে এবং অন্যান্য মডেল গুলো উন্নয়ন, লাইসেনসিং ও স্থাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উদ্ভাবিত

সকল ধরণের এসএমআর এর মডেল, টাইপ, উদ্ভাবনকারী দেশের নাম, ক্ষমতা ও ডিজাইন স্ট্যাটাস সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নের টেবিলে উল্লেখ করা হলো (IAEA, 2020)।

টেবিল ৪: বর্তমান বিশ্বে এসএমআর সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (IAEA, 2023)।

ক্রমিক নং	ধরণ	এসএমআর ডিজাইন, টাইপ ও উদ্ভাবনকারী দেশ	ক্ষমতা (মে:ও:)	ডিজাইন স্টাটাস
১.	Land-based water-cooled SMRs.	CAREM (PWR, Argentina)	৩০	নির্মানাধীন
		ACP100, (PWR, China)	১০০	বিস্তারিত ডিজাইন পর্যায়
		CANDU SMR (PHWR, Canada)	৩০০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন
		CAP200 (PWR, China)	২০০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন
		DHR400 (LWR, China)	৪০০	বেসিক ডিজাইন পর্যয়
		HAPPY200 (PWR, China)	২০০	বিস্তারিত ডিজাইন পর্যায়
		TEPLATORTM (HWR, China)	৫০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন
		NUWARD	২০ x ১৭০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন
		IRIS (PWR,Multiple Countries)	৩৩৫	বেসিক ডিজাইন পর্যয়
		DMS (BWR, Japan)	৩০০	বেসিক ডিজাইন পর্যয়
		IMR (PWR, Japan)	৩৫০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন
		SMART(PWR, Kora & Saudi Arabia)	১০৭	ডিজাইন অনুমোদিত
		RITM-200 (PWR, Russian Federation)	২x৫৩	উন্নয়ন পর্যায়
		UNITHERM (PWR, Russian Federation)	৬.৬	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		VK-300 (BWR, Russian Federation)	২৫০	বিস্তারিত ডিজাইন পর্যায়
		KARAT-45 (BWR, Russian Federation)	৪৫-৫০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		KARAT-100 (BWR, Russian Federation)	১০০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		RUTA-70 (PWR, Russian Federation)	৭০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		ELENA (PWR, Russian Federation)	৬৮	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		UK SMR (PWR, UK)	৪৪৩	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		NuScale (PWR, USA)	১২x৬০	নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পর্যালোচনাধীন
		BWRX-300 (BWR, USA & Japan)	২৭০-২৯০	প্রাক-লাইসেন্সিং পর্যায়
		SMR-160 (PWR, USA)	১৬০	প্রাথমিক ডিজাইন পর্যায়
		W-SMR (PWR, USA)	২২৫	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		mPower (PWR, USA)	২x১৯৫	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়

২.	Marine-based water-cooled SMRs.	KLT-40S (PWR, Russian Federation)	২x৩৫	বিদ্যুৎ উৎপাদন চলোমান
		RITM-200M (PWR, Russian Federation)	২x৫০	উন্নয়ন পর্যায়
		ACPR50S (PWR, China)	৫০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		ABV-6E (PWR, Russian Federation)	৬-৯	চূড়ান্ত ডিজাইন পর্যায়
		VBER-300 (PWR, Russian Federation)	৩২৫	লাইসেন্সিং পর্যায়
		SHELF (PWR, Russian Federation)	৬.৬	বিস্তারিত ডিজাইন পর্যায়
৩.	High Temperature Gas Cooled SMRs	HTR-PM (HTGR, China)	২১০	নির্মানাধীন
		StarCore(HTGR, Canada/UK/US)	১৪/২০/৬০	প্রাক-কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		GTHTR300 (HTGR, Japan)	১০০-৩০০	প্রাক-লাইসেন্সিং পর্যায়
		GT-MHR (HTGR, Russian Federation)	২৮৮	প্রাথমিক ডিজাইন পর্যায়
		MHR-T (HTGR, Russian *Federation)*	৪ × ২০৫.৫	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		MHR-100 (HTGR, Russian Federation)	২৫-৮৭	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		PBMR-400 (HTGR, South Africa)	১৬৫	প্রাথমিক ডিজাইন পর্যায়
		A-HTR-100 (HTGR, South Africa)	৫০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		HTMR-100 (HTGR, South Africa)	৩৫	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		Xe-100 (HTGR, USA)	৮২.৫	বেসিক ডিজাইন পর্যয়
		SC-HTGR (HTGR/MHR-T, USA)	২৭২	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		HTR-10 (HTGR, China)	১০	বিদ্যুৎ উৎপাদন চলোমান
		HTTR-30 (HTGR, Japan)	৩০	বিদ্যুৎ উৎপাদন চলোমান
		RDE (HTGR, Indonesia)	৩	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
৪.	Fast Neutron Spectrum SMRs.	BREST-OD-300 (LMFR, Russian Federation)	৩০০	বিস্তারিত ডিজাইন পর্যায়
		ARC-100(Liquid Sodium)	১০০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		4S (LMFR, Japan)	১০	বিস্তারিত ডিজাইন পর্যায়
		microURANUS(LBR, Korea)	২০	প্রাক-কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		LFR-AS-200 (LMFR, Luxembourg)	২০০	প্রাথমিক ডিজাইন পর্যায়
		LFR-TL-X (LMFR, Luxembourg)	৫-২০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		SVBR (LMFR, Russian Federation)	১০০	বিস্তারিত ডিজাইন পর্যায়
		SEALER (LMFR, Sweden)	৩	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		EM^2(GMFR, USA)	২৬৫	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		Westinghouse LFR (LMFR, USA)	৪৫০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		SUPERSTAR (LMFR, USA)	১২০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
৫.	Molten Salt SMRs	Integral MSR (*MSR*, Canada)	১৯৫	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		smTMSR-400 (MSR, China)	১৬৮	প্রাক-কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		CA Waste Burner 0.2.5 (MSR, Denmark)	২০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		ThorCon (MSR, International Consortium)	২৫০	বেসিক ডিজাইন পর্যয়

		FUJI (MSR, Japan)	২০০	পরীক্ষণ বা টেস্টিং পর্যায়
		Stable Salt Reactor – Wasteburner (MSR, UK/Canada)	৩০০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		LFTR *(MSR, USA)*	২৫০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		KP-FHR (Pebble-bed salt cooled Reactor, USA)	১৪০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		Mk1 PB-FHR (FHR, USA)	১০০	প্রাক-কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		MCSFR (MSR, USA-Canada)	৫০-১২০০	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
৬.	Micro-sized SMRs	Energy Well *(*FHTR, Czech Republic)	৮	প্রাক-কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		MoveluX (Heat Pipe, Japan)	৩-৪	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		U-Battery (HTGR, UK)	৪	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		Aurora (FR, USA)	১.৫	কনসেপচুয়াল ডিজাইন পর্যায়
		Westinghouse eVinci (Heat Pipe, USA)	২-৩.৫	উন্নয়ন পর্যায়
		MMR (HTGR, USA)	৫-১০	প্রাথমিক ডিজাইন পর্যায়

উপসংহার

বাংলাদেশ দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পুরণের জন্য যুগোপযোগী স্বল্প মেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় প্রয়োজন মতো কিছু সংখ্যক Quick Rental Power Plant স্থাপন করেছে। এতদসংক্রান্ত পরিসংখ্যান টেবিল-৩ দেয়া হয়েছে। মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় সরকার বেশ কিছু সংখ্যক গ্যাস, কয়লা ও ফসিল ফুয়েল ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ ও সেই সাথে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ আমদানির ব্যাবস্থা করেছে ।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাইফ টাইম হবে ৬০ থেকে ৮০ বছর। রূপপুরের ন্যায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আরও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পণা সরকারের রয়েছে। সঙ্গত কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের চরসমূহে বড় আকারের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে QRPP স্থানসমূহে দীর্ঘ মেয়াদে এসএমআর স্থাপন করা লাভজনক হবে। উল্লেখ্য যে, দেশের দক্ষিণাঞ্চল একটিভ ডেলটার অংশ হওয়ায় সেখানে প্রতিনিয়ত চর জেগে উঠছে। এসব চরের বয়স ১০০ বছরের কম। সেখানে প্রচলিত বড় আকারের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চেয়ে এসএমআর এর সুবিধাদি বিবেচনায় তা নির্মাণের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে চিন্তা করা যায়। এতে করে অঞ্চলভেদে সুষম ও টেকশই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

BAEC. 2021, চূড়ান্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প, জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (Bangladesh Atomic Energy Commision).

BUBO. 2023, বিদ্যুৎ খাতের অগ্রগতির তথ্য (খসড়া), ১২ জুলাই ২০২৩। বিদ্যুৎ পরিকল্পনা পরিদপ্তর (Biddut Unnayan Board).

IAEA. 2013, Advanced Reactor Information System, International Atomic Energy Agency (ARIS, http://aris.iaea.org).

IAEA. 2020, Advances in Small Modular Reactor Technology Developments, A Supplement to: IAEA Advanced Reactor Information System (ARIS), 2020 Version, International Atomic Energy Agency.

IAEA. 2023, Nuclear Power Reactors in the World, Reference data series no 2, 2022 Version, International Atomic Energy Agency.

PSMP. 2016, Power System Master Plan 2016, Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh. https://powerdivision.portal.gov.bd/sites/default/files/files/powerdivision.portal.gov.bd/page/4f81bf4d_1180_4c53_b27c_8fa0eb11e2c1/PSMP2016%20Final%20Report-compressed.pdf

REVIEW PAPER

Interesting Astronomical Bodies

Oishik Adib[1,*], Courtney L. Broadbent[2] Sharonika Sharon[3]

[1]Department of Molecular Sciences, Macquarie University, Sydney NSW 2109, Australia.
[2]Freelence Author and Researcher, Sydney Australia +60
[3]Department of Mathematics and Natural Sciences, BRAC University, Dhaka 1212, Bangladesh

**Corresponding Author: O. Adib*
Corresponding Email: oishik.adib@students.mq.edu.au

Received: 8/30/2023 / Accepted: 10/9/2023

https://doi.org/10.5281/zenodo.10109966

ABSTRACT

The universe is immensely vast, stretching across inconceivable distances. It contains billions of galaxies, each with billions of stars, and countless planets, moons, and other celestial objects. The sheer enormity of the universe is a testament to its complexity and the wonders it holds, spanning billions of light-years in all directions and offering a glimpse into the grand tapestry of cosmic existence. In this review, we discuss some of the peculiar entities in our universe and how they act.

Keywords: Universe, Galaxies, Milky Way, Exoplanet, Light-years, Stars, Blackholes

Cite this article as: *Adib, O., Broadbent, C.L., Sharon, S. 2023,* The Dance of the Galaxies: Exploring the Cosmic Choreography, *Bangla J. Interdisciplinary Sci., 1 (2): 29-40.*

কিছু বিস্ময়কর মহাজাতিক বস্তু

সারাংশ

এই মহাবিশ্বের বিশালত্ব ও বিস্তৃতি ধারণাতীত। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি, অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র এবং না জানা আরো অনেক কিছুই রয়েছে এ মহাবিশ্বে। কোটি কোটি আলোকবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত এ বিশ্বজগতের অকল্পনীয় বিশালতা এবং জটিলতাই প্রমাণ করে যে মহাবিশ্ব কতটা বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত রকম সুন্দর। এ পর্যালোচনাতে, আমাদের মহাবিশ্বের কিছু অদ্ভুত অস্তিত্ব এবং তারা কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

মূল শব্দগুলি: মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সি, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি, এক্সপ্লানেট, আলক বর্ষ, নক্ষত্র, **ব্ল্যাকহোল**

ভূমিকা

মহাবিশ্বের বিস্তৃতি সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য নয়। এ মহাবিশ্বে রয়েছে কোটি কোটি গ্যালাক্সি অথবা ছায়াপথ। একটি ছায়াপথে রয়েছে অগণিত নক্ষত্র এবং এদের রয়েছে নিজস্ব গ্রহ ব্যবস্থা । ছায়াপথ গুলির মধ্যকার দূরত্ব পরিমাপ করা হয় আলোকবর্ষ দ্বারা । এমনকি আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মধ্যেও নক্ষত্রগুলোর মধ্যকার দূরত্ব অপরিসীম। আলোর গতিতে ভ্রমণ করলে, ধারণা করা হয় একা আমাদের ছায়াপথ অতিক্রম করতেই ১০০,০০০ বছরেরও বেশি সময় দরকার (Friedlander, 2000)। মহাবিশ্বের বিশালতা আমরা যা পর্যবেক্ষণ করতে পারি তার চেয়ে অনেক বেশি প্রসারিত এবং এটি ত্বরান্বিত হারে ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এ মহাবিশ্বে সীমাহীন রহস্যগুলো যেন আমাদের কৌতূহলকে আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। ধারণা করা হয় 'অবজারভেবল ইউনিভার্স' অথবা 'পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্ব' অনেকটা গোলাকৃতির, যার ব্যাস ৯২ বিলিয়ন আলোকবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত এবং আয়তন ৪১০ হাজার বিলিয়ন বিলিয়ন আলোকবর্ষের (nonillion) সমান (Bars et al., 2010)। এর গ্যালাক্সিগুলোর ঘনত্ব অনুমান করা অনেক কঠিন। কারণ একটি একটি করে গ্যালাক্সি গণনা করা শুধু অসম্ভবই নয়, অনেক সময়সাপেক্ষও বটে। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে উন্নত টেলিস্কোপগুলিও হয়তো কিছু গ্যালাক্সি শনাক্ত করতে পারবে না। এই অপরিসীম মহাবিশ্বের মাঝে একটি হলুদ রঙের বামনাকৃতির তারা- সূর্য এবং কয়েকটি গ্রহ দিয়েই আমাদের সৌরজগৎ গঠিত। এখানে এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ছোট্ট সৌরজগৎ পেরিয়ে মহাবিশ্বের অন্যান্য অদ্ভুত মহাজাগতিক সত্তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

আলোচনা

গ্রহ: গ্রহ হলো এক ধরনের মহাজাগতিক বস্তু যা নক্ষত্রকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করতে থাকে অথবা নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। তারা সাধারণত গ্রহাণু অথবা ধূমকেতু থেকে সৃষ্টি হয় এবং মধ্যাকর্ষণ বলের কারণে

গোলাকৃতির হয়ে থাকে। গ্রহগুলো পৃথিবীর মতো পাথুরে অথবা জুপিটারের মতো গ্যাসীয় হতে পারে। তারা আকারে এবং গঠনে ভিন্ন হয়। উপগ্রহগুলো গ্রহকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে।

I. পৃথিবী ২.০ (**Earth 2.0**)

কেপলার-৪৫২বি (Kepler-552 b)-কে সাধারণত পৃথিবীর দূর সম্পর্কের ভাই বলা হয়; কারণ পৃথিবীর সাথে গ্রহটির অনেক মিল রয়েছে। এটিও একটি পাথুরে গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর মতোই গ্রহটির শক্ত ভূপৃষ্ঠ রয়েছে, যা জুপিটারের মতো গ্যাসীয় না। গ্রহটি তার সৌরজগতের 'বাসযোগ্য স্থান'-এ অবস্থিত যাকে 'হ্যাবিটেবল জোন'ও বলা হয়। অর্থাৎ গ্রহটি এমন একটি অবস্থান এবং পরিস্থিতিতে রয়েছে, যা তার পৃষ্ঠে তরল পানি (যা জীবনের অস্তিত্বের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ) থাকার সম্ভাবনাকে সমর্থন করে (Jenkins et al., 2015; Mullally et al., 2018)।

কেপলার-৪৫২বি গ্রহটি কেপলার-৪৫২ নামক নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে (চিত্র ১), যার সাথে আমাদের সূর্যের আকার এবং তাপমাত্রার অনেক মিল রয়েছে। নক্ষত্রটি একটি জি টাইপ মেন সিকোয়েন্স নক্ষত্র, যাকে অনেক সময় জিটুভি তারাও বলা হয়। কেপলার ৪৫২ তারাটিকে কেপলার ৪৫২বি- এর প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে আনুমানিক ৩৮৫ দিন, যা পৃথিবীর সৌর বর্ষের কাছাকাছি (Jenkins et al., 2015)।

কেপলার ৪৫২বি-কে মানবজাতির বসবাসের জন্য সম্ভাব্য বাসযোগ্য গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও আমরা তার বায়ুমণ্ডল এবং পরিবেশ সম্পর্কে খুব কম জানি। গ্রহটির বায়ুমণ্ডলীয় এবং ভূপৃষ্ঠের অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছাড়া, মানবজাতির বসতি স্থাপনের চেষ্টা করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া আমাদের বর্তমান প্রযুক্তির সহায়তায় মানুষ তো দূরের কথা, এমন কি রোবটদেরও এত দূরের একটি বহির্গ্রহে পাঠানো প্রায় অসম্ভব। এই ১৪০০ আলোকবর্ষের বিশাল দূরত্বে সম্ভাব্য কোনো অভিযাত্রী অথবা বসতি স্থাপনকারীদের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করাও প্রায় অসম্ভব। কেননা এক্ষেত্রে তথ্য আদান-প্রদান করতেই হাজার হাজার বছর লেগে যাবে (Silva et al., 2017; Hu et al., 2017)।

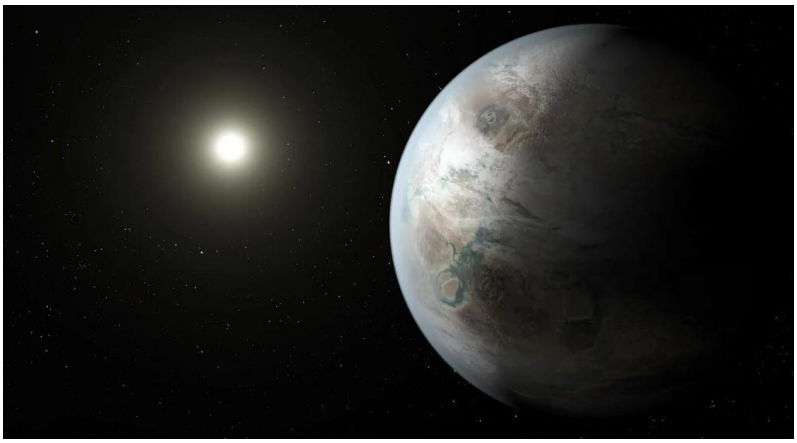

চিত্র ১: কেপলার-৪৫২বি (Credit: Gregersen, 2023)।

II. গতির রাজা

পিএসআর জে১৭১৯-১৪ বি (PSR J1719-14 b) গ্রহটির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য গ্রহটির গতি। পিএসআর জে১৭১৯-১৪ বি গ্রহটি একটি চুম্বক আবর্তিত নিউট্রন তারাকে খুব কাছাকাছি, প্রায় ছয় লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বে প্রদক্ষিণ করে। সহজভাবে বলতে গেলে বুধ গ্রহ যতটা না সূর্যের কাছাকাছি অবস্থান করে এই গ্রহটি তার কেন্দ্রীয় তারকার পঞ্চাশ গুণ বেশি কাছে অবস্থান করে। তারকাটির সন্নিকটে থাকার কারণে গ্রহটির প্রদক্ষিণ কাল খুবই কম অর্থাৎ গ্রহটি মাত্র ২.২ ঘন্টায় তার নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করতে পারে। পৃথিবীতে যদি কারো ২১ বছর বয়স হয়, ওই দ্রুতগতির গ্রহের সৌর বর্ষের সাথে তুলনা করলে ওই ব্যক্তির বয়স ৮৪ হাজার বছর দাঁড়াবে (Kuerban et al., 2020; Ray and Loeb, 2017)।

III. সবচেয়ে পুরনো গ্রহ

পিএসআর বি১৬২০-২৬ বি (PSR B1620-26 b) হলো এক ধরনের বহির্গ্রহ অথবা exo-planet, যা এক অদ্ভুত বাইনারি স্টার সিস্টেমে অবস্থিত। PSR B1620-26-কে মেথুসেলাহ অর্থাৎ অতি দীর্ঘায়ু গ্রহ নামে ডাকা হয়। ধারনা করা হয় গ্রহটার বয়স ১২.৭ বিলিয়ন বছর; যেখানে আমাদের বিশ্বজগতের বয়সই ১৩.৮ বিলিয়ন বছর (Ford et al., 2000)। তাই এই গ্রহটিকে সবচেয়ে প্রাচীনতম গ্রহ বলা হয়। মজার কথা হলো মেথুসেলাহ নামে শুধু গ্রহ নয়, তারাও আছে যার বয়সও আমাদের বিশ্বজগতের বয়সের কাছাকাছি।

গ্রহটির আরেকটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, গ্রহটি শুধু একটি নয় দুটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে, যা একটি বাইনারি স্টার সিস্টেমকে অনুসরণ করে। এই দুই নক্ষত্রের একটি হলো শ্বেত বামন তারকা এবং আরেকটি নিউট্রন তারা। PSR J1719-14 b যে বাইনারি স্টার সিস্টেমে দুটো তারাকে প্রদক্ষিণ করে তা দেখতে অনেকটা মহাজাগতিক নৃত্যের মতো (Thorsett et al., 1999)।

খুব সহজভাবে বলতে গেলে, দুইটি তারা অথবা দুইটি আলোর বল আছে, যারা মহাকর্ষ বল দিয়ে একসাথে যুক্ত রয়েছে এবং একে অপরের চারপাশে সব সময় ঘুরছে। এদের একটি হচ্ছে শ্বেত বামন। এটি একটা পুরনো তারা এবং এর শক্তিও শেষের পথে। অপরটি হলো নিউট্রন দিয়ে তৈরি একটি পালসার অথবা নিউট্রন তারা, যা আকারে খুবই ক্ষুদ্র কিন্তু বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে ঘুরছে। তারকদ্বয়ের এই নাচে PSR J1719-14 b নামের গ্রহটিও জড়িত রয়েছে। গ্রহটি একটি ছোট বলের মতো, যা দুটি তারাকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, ঠিক যেভাবে চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। তাই তারা দুটি যখন নিজের মতো করে একে অপরের সাথে নাচতে থাকে তখন গ্রহটিও তারা দুটির চারপাশে নিজস্ব কক্ষপথ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তাদের সাথে নাচে যোগ দেয়। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি প্রায় শতকোটি বছরের পুরনো। এই দীর্ঘ সময় ধরে তারাগুলো এবং গ্রহটি একই নিয়মে নেচে চলেছে।

IV. দ্যা ডার্ক নাইট (অন্ধকারের সৈনিক)

টিআরইএস-২বি (TrES-2b) এমন এক একটি বহির্গ্রহ, যা প্রায় ৭৫০ আলোকবর্ষ দূরে ড্রেকো (Draco) নামক ছায়াপথে অবস্থিত। গ্রহটির আলবেডো অর্থাৎ আলোকরশ্মি প্রত্যাবর্তনের মাত্রা এতটাই কম যে, গ্রহটিকে বিশ্বের অন্ধকারতম গ্রহগুলোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রহটি যতটুকু আলো পায় তার এক শতাংশেরও কম আলো সে প্রতিফলিত করে। ফলে টিআরইএস-২বি (TrES-2b) কে কয়লা অথবা কালো এক্রেলিক রং এর থেকেও আরো বেশি কালো করে ফেলে (Kipping & Bakos, 2011; Croll et al., 2010; Öztürk and Erdem, 2019)। ধারনা করা হয় এই বৈশিষ্ট্যটির কারণ গ্রহটির অতিরিক্ত তাপমাত্রা। গ্রহটি তার কেন্দ্রীয় তারকা টিআরইএস-২ (TrES-2) কে মাত্র ৪ মিলিয়ন মাইল দূরত্বে প্রদক্ষিণ করে; যা প্রায় ৬.৪ মিলিয়ন কিলোমিটার এর সমান। কেন্দ্রীয় নক্ষত্রের এত নিকটে থাকার কারণে গ্রহটির পৃষ্ঠের তাপমাত্রাও অতিরিক্ত বেশি। গ্রহটি গ্যাসীয় প্রকৃতির এবং এর তাপমাত্রা প্রায় ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা ১৮০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের সমান। মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা এবং গ্যাসীয় দানবাকৃতি হওয়ার কারণে এই গ্রহটিকে 'হট জুপিটার' অথবা 'উষ্ণ বৃহস্পতি' ডাকা হয় (Mislis et al., 2010; Winn et al., 2008)।

V. দ্যা রেবেল (বিদ্রোহী)

এইচএটি-পি-৭বি (HAT-P-7b) নামের অদ্ভুত ধরনের বহির্গ্রহটি ১০৪০ আলোকবর্ষ দূরে সিগনাস (Cygnus) নামক ছায়াপথে অবস্থিত। গ্রহটির একটি ভিন্নধর্মী কক্ষপথ রয়েছে, যা তার কেন্দ্রীয় তারার ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে একটু বাঁকা। অর্থাৎ গ্রহটির কক্ষপথ তারাটির বিষুবরেখা বরাবর নয়। এই ধরনের 'বক্র' কক্ষপথ এইচএটি-পি-৭বি গ্রহটির মতো হট জুপিটারদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য (Pál et al., 2008; Borucki et al., 2009; Helling et al., 2019)। এই ব্যক্তিক্রমী কক্ষপথ গ্রহটির গঠন এবং সৌরজগতীয় ইতিহাস সম্পর্কে অনেক ধরনের প্রশ্ন তৈরি করেছে। ধরা যাক এইচএটি-পি-৭বি গ্রহটি তার কেন্দ্রীয় তারা এইচএটি-পি-৭ কে ঘিরে মহাকাশে নাচছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রহগুলো তাদের কেন্দ্রীয় তারার মাঝ বরাবর একটি কক্ষপথে নাচতে থাকে। কিন্তু এইচএটি-পি-৭বি গ্রহটি একটি ব্যতিক্রমী গ্রহ। সাধারণ নাচের নিয়ম অনুসরণ না করে সে নিজের মতো একটা বাঁকা কক্ষপথে তার কেন্দ্রীয় তারাকে ঘিরে নাচতে থাকে, যা তাকে অন্য গ্রহদের থেকে আলাদা করে। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে গ্রহটির নিজস্বতা প্রকাশ পায় (Narita et al., 2009)।

নক্ষত্র: নক্ষত্র বা তারারা উজ্জ্বল মহাজাগতীয় বস্তু যা প্রাথমিকভাবে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম দিয়ে তৈরি এবং কেন্দ্রে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার কারণে তারা আলো ও তাপ উৎপাদন করে। বিশাল বিশাল গ্যালাক্সি অথবা ছায়াপথগুলো তারা দিয়েই তৈরি এবং এই তারা অথবা নক্ষত্ররাই মহাবিশ্বের সকল শক্তি ও আলোর উৎস হিসেবে কাজ করে।

I. ছোট কিন্তু শক্তিশালী

ইবিএমএল জে০৫৫৫-৫৭এবি (EBML J0555-57Ab) একটি অসাধারণ তারা। এটি অতি ক্ষুদ্র সময়কালের বাইনারি সিস্টেম নামে পরিচিত। নক্ষত্রটি মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম তারাগুলোর একটি। তারাটি এতই ছোট এবং এতই ক্ষুদ্র যে কখনো কখনো তারাটিকে 'ব্যর্থ তারা' অথবা 'বাদামি বামন তারা' নামে অভিহিত করা হয়। তারাটি আকৃতিতে আমাদের সৌরজগতের শনি গ্রহ থেকে একটু বড় (von Boetticher et al., 2017; von Boetticher et al., 2019) । ভরের দিক থেকে চিন্তা করলে তারাটি তার আকারের সাপেক্ষে অনেক ভারি , অন্যান্য বাদামি বামন তারাদের মতো। তারাটির ভর আমাদের সৌরজগতের বৃহস্পতি গ্রহের থেকে প্রায় ৮৫ গুণ বেশি। পৃথিবী থেকে প্রায় ৭০০ আলোকবর্ষ দূরে পিকটর (Pictor) নামক ছায়াপথে নক্ষত্রটি অবস্থিত (Chen et al., 2022)।

II. তাত্ত্বিক তারা

পদার্থবিদ কিপ থর্ণ (Kip Thorne) এবং অ্যানা জিটকো (Anna Zytkow) ১৯৭৫ সালে তাত্ত্বিক ধরনের তারা আবিষ্কার করেন, যা থর্ণ-জিটকো তারা অথবা টিজেও (TZO) টিজেওস (TZOs) নামে পরিচিত। (Vanture et al., 1999; Podsiadlowski et al., 1995)।

সাধারণত থর্ণ-জিটকো অথবা তাত্ত্বিক তারাগুলো নিউট্রন তারা ও রেড সুপার জায়েন্ট তারার মিলনে গঠিত হয়। ধারণা করা হয় একটা নিউট্রন তারা হলো অনেক বড় একটি তারার অত্যন্ত ঘন অবশেষ, যা সুপার নোভা বিস্ফোরণের কারণে তৈরি হয়েছে। এই নিউট্রন তারাটি রেড সুপারজায়ন্ড এর কেন্দ্রে এমনভাবে অবস্থান করে যেন মনে হয় রেড সুপার জয়েন্টটা নিউট্রন তারাটিকে গ্রাস করে ফেলেছে। সাধারণত একটি বাইনারি সিস্টেমে অবস্থিত একটি নিউট্রন তারা তার সঙ্গী রেড সুপার জায়ান্ট তারার সাথে মিলিত হওয়ার কারণে এই ধরনের তাত্ত্বিক তারাগুলো গঠিত হয় (DeMarchi et al., 2021)।

III. বিস্ফোরণ তারা

পৃথিবী থেকে প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ হয় এবং এই ঘটনাটিকে iPF14hls অথবা SN 2014C নামে অভিহিত করা হয়। সুপার নোভা বিস্ফোরণের এই ঘটনাটি ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে আবিষ্কার করা হয় (Margutti et al., 2017)।

সাধারণত একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের সময় তারাটি তার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল পর্যায়ে থাকে এবং বিস্ফোরণ শেষে আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যায়। এই তারাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে তারাটি প্রায় ৬০০ দিন পর পর বিস্ফোরিত হয়। শুধু তাই নয় তারাটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ক্রমাগত বিস্ফোরিত হয়ে যাচ্ছে যা সাধারণ সুপারনোভা বিস্ফোরণের ব্যতিক্রম। এর প্রত্যেক বিস্ফোরণের সাথে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, যা সাধারণ সুপারনোভা বিস্ফোরণের থেকে অনেক গুণ বেশি (Milisavljevic et al., 2015; Borucki et al., 2009; Vargas et al., 2022) ।

IV. প্রাচীনতম তারা

মেথুসেলাহ (Methuselah) নামে যেমন গ্রহ আছে তেমনি তারাও আছে, যার নাম HD 140283। তারাটি লিব্রা অর্থাৎ তুলারাশির নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত একটি সাবজায়েন্ট তারা, যা পৃথিবী থেকে প্রায় ১৯০.১ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি অথবা আকাশগঙ্গার সবচেয়ে পুরনো এবং গবেষণা হয়েছে এমন তারাগুলোর মধ্যে একটি হলো এই HD 140283। ধারণা করা হয়, তারাটি প্রায় ১৩.৫ বিলিয়ন বছরের পুরনো একটি তারা, যেখানে আমাদের মহাবিশ্বের বয়সই ১৩.৮ বিলিয়ন বছর। এই কারণে তারাটিকে প্রাচীনতম তারা হিসেবে অভিহিত করা হয় অর্থাৎ তারাটির বয়স আমাদের মহাবিশ্বের বয়সের থেকে একটু কম (Bond et al., 2013; Siqueira-Mello et al., 2015; Gallagher et al., 2010)।

বিভিন্ন গ্যালাক্সি এবং ব্ল্যাক হোল: গ্যালাক্সি অথবা নক্ষত্রপুঞ্জ হলো অসংখ্য তারা, তারাদের অবশেষ, আন্তঃ নক্ষত্রিক গ্যাস-ধুলো এবং ডার্ক ম্যাটারের তৈরি একটি বিশাল সিস্টেম, যা মধ্যাকর্ষণ বলের মাধ্যমে একত্রিত রয়েছে। শত শত লক্ষ-কোটি তারা নিয়ে তৈরি এই গ্যালাক্সিগুলো বিভিন্ন আকার ও আকৃতির হয়ে থাকে। মাঝেমধ্যে নক্ষত্রপুঞ্জ অথবা গ্যালাক্সিগুলোর কেন্দ্রে সুপারমাসিভ ব্ল্যাক হোল থাকে, যাদেরকে কৃষ্ণ বিবর অথবা কৃষ্ণ গহ্বর নামে অভিহিত করা হয়। কৃষ্ণ গহ্বর হলো মহাকাশের বিশেষ স্থানে অতি ক্ষুদ্র আয়তন জুড়ে অবস্থিত ঘন সন্নিবিষ্ট একটি বস্তু। ব্ল্যাক হোল অথবা কৃষ্ণ গহ্বরের মহাকর্ষীয় বল এতটাই বেশি হয় যে আলো পর্যন্ত তার থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। দানবাকৃতির তারাগুলোর যখন পারমাণবিক জ্বালানি শেষ হয়ে যায় তখন তাদের মৃত্যু হয়। সেই তারাগুলোর অবশেষ থেকে অল্প জায়গা জুড়ে অত্যন্ত বেশি পরিমাণ ঘনত্ব বিশিষ্ট ভর থেকে তৈরি হয় কৃষ্ণ গহ্বর (Weerasooriya et al., 2023)।

I. মহাজাতিক সংঘর্ষ

ছোট ছোট গ্যালাক্সিগুলো যখন বড় বড় গ্যালাক্সিদের নিকটে চলে আসে তখন বড় গ্যালাক্সিগুলো কালের আবর্তনে সেই সকল ছোট ছোট গ্যালাক্সিকে গ্রাস করে ফেলে। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিও সেই বড় বড় গ্যালাক্সিদের দলে পড়ে (চিত্র ২)। এই ধরনের ঘটনাগুলো প্রাকৃতিকভাবেই গ্যালাকটিক বিবর্তনের অংশ। আমাদের কাছে ঐ সকল ছোট ছোট গ্যালাক্সিদের সম্পূর্ণ তালিকা না থাকলেও কিছু কিছু ঘটনা প্রমাণ করে যে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি অন্যান্য ছোট ছোট গ্যালাক্সিদের কালের আবর্তনে গ্রাস করেছে (Weerasooriya et al., 2023 & Gilmore, 1999)।

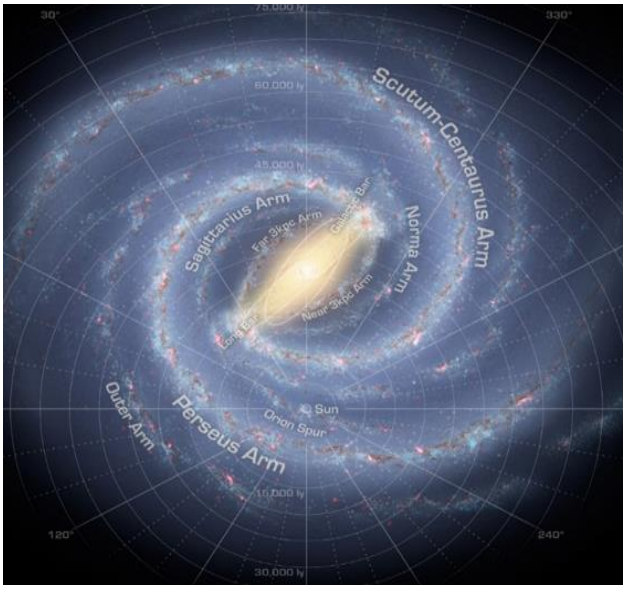

চিত্র ২: মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি (Credit: NASA, 2017)।

ক্যানিস মেজর ডোয়ার্ফ গ্যালাক্সি (Canis major dwarf galaxy)**:** ছোট ছোট গ্যালাক্সি গুলোর একটি উদাহরণ হলো ক্যানিস মেজর ডোয়ার্ফ গ্যালাক্সি, যা আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির খুব কাছে অবস্থিত একটি তারার প্রবাহ যা প্রমাণ করে গ্যালাক্সিটি আমাদের গ্যালাক্সির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল (Forbes et al., 2004)।

নক্ষত্রিক প্রবাহ (stellar stream)**:** আমাদের আকাশগঙ্গা অথবা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির আশেপাশে অবস্থিত তারাদের প্রবাহকে পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতির্বিদরা ধারণা করেন যে ওই সকল নক্ষত্রের প্রবাহগুলো ছোট ছোট গ্যালাক্সিদের ধ্বংসাবশেষ। এই সকল ছোট ছোট গ্যালাক্সি গুলো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল এবং পরে আকাশগঙ্গার একটি অংশ হয়ে গিয়েছে। Monoceros Ring এবং Triangulum-Andromeda নক্ষত্রিক প্রবাহগুলো মূলত পূর্ববর্তী সংঘর্ষেরই দৃষ্টান্ত (Bonaca et al., 2012)।

II. দ্য আই (চক্ষু)

ক্যামিস মেজর নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত একটি গ্যালাক্সি হলো IC 2163 । গ্যালাক্সিটির কেন্দ্র থেকে দুই দিকে ফিনকি দিয়ে গ্যাসগুলো অথবা তারাদের প্রবাহ বের হয়ে যাচ্ছে, যা দেখতে অনেকটা চোখের মতো। এই অদ্ভুত রূপের কারণে গ্যালাক্সিটিকে টুইন জেট নেবুলা গ্যালাক্সি (twin jet nebula galaxy) নামেও ডাকা হয় (Struck et al., 2005; Jencson et al., 2017)।

সর্পিলাকার IC 2163 গ্যালাক্সিকে দেখলে মনে হয় একটা বিশাল চোখ মহাকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। যখন IC 2163 সর্পিলাকার গ্যালাক্সিটি NGC 2207 গ্যালাক্সিটির সাথে মিলিত হয় তখন নক্ষত্র ও ধুলোর বিশাল প্রবাহ তৈরি করে যাকে দেখতে চোখের মতো মনে হয়। ২০১৬ সালে

জ্যোতির্বিদ মিশেল কফম্যান (Mishel Kaufman) মহাকাশের এই চোখটি আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানীরা আরও আবিষ্কার করেন যে চোখের গ্যাসগুলো সেকেন্ডে ৬২ মাইল অথবা সেকেন্ডে ১০০ কিলোমিটার কেন্দ্রের দিকে ভ্রমণ করে এবং কেন্দ্রে পৌঁছানোর আগেই ঢেউয়ের মতো গ্যালাক্সিটির পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে (Jencson et al., 2017; Elmegreen et al., 2017)।

III. টু হার্টস (দুই হৃদয়)

রেডিও গ্যালাক্সি 0402+379 বিস্ময়কর একটি বাইনারি ব্ল্যাক হোল সিস্টেম। এই বিস্ময়কর মহাজাগতিক ঘটনাটি দুটি বিশালদেহী কৃষ্ণ গহ্বরের কারণে ঘটেছে। এখানে বৃহদাকার ব্ল্যাকহোল দুটি একই গ্যালাক্সির ভিতরে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে।

রেডিও গ্যালাক্সিগুলোর কেন্দ্রে সুপারমাসিভ ব্ল্যাকহোল থাকার কারণে গ্যালাক্সিগুলো শক্তিশালী রেডিও তরঙ্গ নিঃসরণ করে। এমন একটি রেডিও গ্যালাক্সিকে 0402+379 দিয়ে চিহ্নিত করা হয় (Rodriguez et al., 2006; Rodriguez et al., 2009)।

যখন দুটি সুপারমাসিভ ব্ল্যাকহোল খুব কাছে থেকে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে তখন যে সিস্টেমটি তৈরি হয়, তা বাইনারি ব্ল্যাকহোল সিস্টেম নামে পরিচিত। যখন দুটি গ্যালাক্সি মিলিত হয় তখন তাদের কেন্দ্রের ব্ল্যাকহোলগুলো মহাকর্ষ বলের কারণে একে অপরের সাথে মহাকর্ষীয় বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে 0402+379 গ্যালাক্সিটির ক্ষেত্রে সুপারমাসিভ ব্ল্যাকহোল দুটি মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে একে অপরের সাথে এমনভাবে আবদ্ধ রয়েছে, যা দেখে মনে হয় তারা একে অপরকে ঘিরে নাচছে, এক মহাজাগতীয় নৃত্যের মতো। (Bansal et al., 2017; Fabbiano et al., 2011)

উপসংহার

মহাবিশ্বের বিস্ময়ের আসলে কোনো শেষ নেই। এত ভিন্ন ধরনের মহাজাগতীয় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, যা বর্ণনা করে শেষ করা অসম্ভব। আমরা শুধু এই অসীম মহাকাশের ক্ষুদ্র ধারণা গ্রহণ করতে পারি। মহাকাশের এই বিশালতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরেও যে জগৎ রয়েছে তার রহস্যের জাল সুদূর প্রসারিত। অসীম এই মহাবিশ্বের সামান্য কিছু অনন্য সদস্য নিয়ে এই লেখাটি আলোচনা করে বিস্তৃত মহাকাশ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জানা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভব বিষয়টিই মানবজাতিকে প্রভাবিত করে আরো বেশি জানার জন্য, খোঁজার জন্য, পর্যবেক্ষণ করার জন্য, আর ক্রমাগত চমৎকৃত হওয়ার জন্য।

তথ্যসূত্র

Bansal, K, Taylor G.B., Peck A.B., et al. 2017, Constraining the orbit of the supermassive black hole binary 0402+379. The Astrophysical. J. 843:14, Doi: 10.3847/1538-4357/aa74e1

Bonaca, A., Geha, M., Kallivayalil, N. 2012, A cold milky way stellar stream in the direction of Triangulum. The Astrophysical. J., Doi: 10.1088/2041-8205/760/1/l6

Bond, H.E., Nelan, E.P., VandenBerg, D.A., et al. 2013, HD 140283: A star in the solar neighborhood that formed shortly after the big bang. The Astrophysical. J., Doi: 10.1088/2041-8205/765/1/l12

Borucki, W.J., Koch, D., Jenkins, J., et al. 2009, Kepler's optical phase curve of the exoplanet hat-p-7b. Science 325:.709-709., Doi: 10.1126/science.1178312

Borucki, W.J., Koch, D., Jenkins, J., et al. 2009, Kepler's optical phase curve of the exoplanet hat-p-7b, Science, 325 (5941): 709-709., Doi:10.1126/science.1178312.

Chen, Y., Tang, Y., Ling, D., Wang, Y. 2022, Hypergravity experiments on Multiphase Media Evolution. Science China Technological Sciences. 65:.2791-2808, Doi: 10.1007/s11431-022-2125-x

Croll, B., Albert, L., Lafreniere, D. et al. 2010, Near-infrared thermal emission from the hot jupiter tres-2b: Ground-based detection of the secondary eclipse. The Astrophysical. J. 717: 1084-1091, Doi: 10.1088/0004-637x/717/2/1084

DeMarchi, L., Sanders, J.R., Levesque, E.M. 2021, Prospects for Multimessage observations of Thorne–żytkow objects. The Astrophysical. J. 911:101, Doi: 10.3847/1538-4357/abebe1

Elmegreen, D.M., Elmegreen, B.G., Kaufman, M. et al. 2017, Alma co clouds and young star complexes in the interacting galaxies IC 2163 and NGC 2207. The Astrophysical. J. 841:43, Doi: 10.3847/1538-4357/aa6ba5

Fabbiano, G., Wang, J., Elvis, M., Risaliti, G. 2011, A close nuclear black-hole pair in the spiral galaxy NGC 3393. Nature 477: 431-434, Doi: 10.1038/nature10364

Forbes, D.A., Strader, J., Brodie, J.P. 2004, The globular cluster system of the Canis major dwarf galaxy. The Astronomical J. 127: 3394-3398, Doi: 10.1086/421003

Ford, E.B., Joshi, K.J., Rasio, F.A., Zbarsky, B. 2000, Theoretical implications of the PSR B1620−26 triple system and its planet. The Astrophysical J. 528: 336-350, Doi: 10.1086/308167

Gallagher, A.J., Ryan, S.G., García, P.A.E., Aoki, W. 2010, The barium isotopic mixture for the metal-poor subgiant star HD 140283. Astronomy Astrophysics, Doi: 10.1051/0004-6361/201014970

Gilmore, G. 1999, Mysteries of the Milky Way. Nature 400:402–403, Doi: 10.1038/22640

Gregersen, E. 2023, Kepler-452bErik. In: Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/place/Kepler-452b (Accessed 27 Aug 2023).

Helling, C., Iro, N., Corrales, L. et al. 2019, Understanding the atmospheric properties and chemical composition of the ultra-hot Jupiter hat-p-7b. Astronomy Astrophysics, Doi: 10.1051/0004-6361/201935771

Hu, Y., Wang, Y., Liu, Y., Yang, J. 2017, Climate and habitability of Kepler 452b simulated with a fully coupled atmosphere–ocean general circulation model. The Astrophysical J., Doi: 10.3847/2041-8213/aa56c4

Jencson, J.E., Kasliwal, M.M., Johansson, J., et al. 2017, Spirits 15c and spirits 14buu: Two obscured supernovae in the nearby star-forming Galaxy IC 2163. The Astrophysical J. 837: 167, Doi: 10.3847/1538-4357/aa618f

Jenkins, J.M., Twicken, J.D., Batalha, N.M., et al. 2015, Discovery and validation of kepler-452b: A 1.6 *R* super earth exoplanet in the habitable zone of a G2 star. The Astronomical Journal 150:56, Doi: 10.1088/0004-6256/150/2/56

Kipping, D., Bakos, G. 2011, Analysis ofkepler's short-cadence photometry for tres-2b. The Astrophysical J. 733: 36, Doi: 10.1088/0004-637x/733/1/36

Kuerban, A., Geng, J., Huang, Y., et al. 2020, Close-in exoplanets as candidates for strange quark matter objects. The Astrophysical J. 890: 41, Doi: 10.3847/1538-4357/ab698b

Margutti, R., Kamble, A., Milisavljevic, D., et al. 2017, Ejection of the massive hydrogen-rich envelope timed with the collapse of the stripped SN 2014C. The Astrophysical J. 835: 140, Doi: 10.3847/1538-4357/835/2/140

Milisavljevic, D., Margutti, R., Kamble, A., et al. 2015, Metamorphosis of SN 2014C: Delayed interaction between a hydrogen poor core-collapse supernova and a nearby Circumstellar Shell. The Astrophysical J. 815: 120, Doi: 10.1088/0004-637x/815/2/120

Mislis, D., Schröter, S., Schmitt, J.H., et al. 2010, Multi-band Transit Observations of the tres-2b exoplanet. Astronomy Astrophysics, Doi: 10.1051/0004-6361/200912910

Mullally, F., Thompson, S.E., Coughlin, J.L. et al. 2018, kepler's Earth-like planets should not be confirmed without independent detection: The case of Kepler-452b. The Astronomical Journal 155:210, Doi: 10.3847/1538-3881/aabae3

NASA, JPL-Caltech, SSC/Caltech (R. Hurt). 2017, The Milky Way galaxy. NASA. https://solarsystem.nasa.gov/resources/285/the-milky-way-galaxy/ (Accessed Aug 27, 2023)

Öztürk, O., Erdem, A. 2019, New photometric analysis of five exoplanets: CoRoT-2b, HAT-P-12b, TrES-2b, WASP-12b, and WASP-52b. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 486 (2): 2290-2307, Doi: https://doi.org/10.1093/mnras/stz747

Pál, A., Bakos, G., Torres, G., et al. 2008, Hat-P-7b: An extremely hot massive planet transiting a bright star in the Kepler field. The Astrophysical J. 680: 1450-1456, Doi: 10.1086/588010

Podsiadlowski, P., Cannon, R.C., Rees, M.J. 1995, The evolution and final fate of massive Thorne-żytkow objects. Monthly Notices of the Royal Astronomical Soc. 274: 485-490, Doi: 10.1093/mnras/274.2.485

Ray, A., Loeb, A. 2017, Inferring the composition of Super-Jupiter Mass Companions of pulsars with Radio Line Spectroscopy. The Astrophysical J. 836: 135, Doi: 10.3847/1538-4357/aa5b7d

Rodriguez, C., Taylor, G.B., Zavala, R.T., et al. 2006, A compact supermassive binary black hole system. The Astrophysical J. 646:.49-60, Doi: 10.1086/504825

Rodriguez, C., Taylor, G.B., Zavala, R.T., et al. 2009, H I observations of the supermassive binary black hole system in 0402+379. The Astrophysical J. 697: 37-44, Doi: 10.1088/0004-637x/697/1/37

Silva, L., Vladilo, G., Murante, G., Provenzale, A. 2017, Quantitative estimates of the surface habitability of Kepler-452b. Monthly Notices of the Royal Astronomical Soc., 470 (2): 2270-2282, Doi: https://doi.org/10.1093/mnras/stx1396

Siqueira-Mello, C., Andrievsky, S., Barbuy, B., et al. 2015, High-resolution abundance analysis of HD 140283. Astronomy Astrophysics, Doi: 10.1051/0004-6361/201526695

Struck, C., Kaufman, M., Brinks, E., et al. 2005, The grazing encounter between IC 2163 and NGC 2207: Pushing the limits of observational modelling. Monthly Notices of the Royal Astronomical Soc. 364: 69–90, Doi: 10.1111/j.1365-2966.2005.09539.x

Thorsett, S.E., Arzoumanian, Z., Camilo, F., Lyne, A.G. 1999, The triple pulsar system PSR B1620−26 in M4. The Astrophysical J. 523: 763-770, Doi: 10.1086/307771

Vanture, A.D., Zucker, D., Wallerstein, G. 1999, Is U Aquarii a thorne-żytkow object? The Astrophysical Journal 514:.932-938, Doi: 10.1086/306956

Vargas, F., De Colle, F., Brethauer, D., et al. 2022, Survival of the fittest: Numerical Modeling of SN 2014C. The Astrophysical J. 930:150, Doi: 10.3847/1538-4357/ac649d

von Boetticher, A., Triaud, A.H., Queloz, D., et al. 2017, The EBLM project. Astronomy Astrophysics, Doi: 10.1051/0004-6361/201731107

von Boetticher, A., Triaud, A.H., Queloz, D., et al. 2019, The EBLM project. Astronomy Astrophysics, Doi: 10.1051/0004-6361/201834539

Weerasooriya, S., Bovill, M.S., Benson, A., et al. 2023, Devouring the milky way satellites: Modeling dwarf galaxies with Galacticus. The Astrophysical Journal 948: 87, Doi: 10.3847/1538-4357/acc32b

Winn, J.N., Johnson, J.A., Narita, N., et al. 2008, The prograde orbit of exoplanet tres-2b. The Astrophysical Journal 682:1283-1288, Doi: 10.1086/589235

REVIEW PAPER

Transmission, Symptoms, Treatment, and Prevention of Dengue Fever: A Formidable Healthcare Challenge in Bangladesh

M. Iftekhar Ullah[1], Iftekhar M. Rafiqullah[2], M. S. Zaman[3,4,*]

[1]Department of Medicine, University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi 39216, USA; [2]Department of Cell and Molecular Biology, University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi 39216, USA; [3]Department of Biological Sciences, Alcorn State University, Lorman, MS 39076, USA; [4]Department of Biology, South Texas College, McAllen, TX 78501, USA

**Corresponding Author: M. S. Zaman*
Corresponding Email: zaman@alcorn.edu, mzaman@southtexascollege.edu

Received: 9/15/2023 / Accepted: 11/11/2023

https://doi.org/10.5281/zenodo.10199449

ABSTRACT

Dengue fever, caused by the dengue virus and transmitted by Aedes mosquitoes, is an escalating global health concern. Predominant in tropical and subtropical regions, it threatens the health of millions worldwide. The virus comprises four serotypes, DENV-1, DENV-2, DENV-3, and DENV-4. All these serotypes are closely related. Symptoms of the disease emerge 4 to 10 days after infection and encompass high fever, severe headache, muscle pain, rash, and bleeding. While dengue fever is usually non-lethal, the infection may potentially lead to severe complications, e.g., dengue hemorrhagic fever (DHF) and dengue shock syndrome (DSS). DHF and DSS can be fatal due to internal bleeding and organ failure. *Aedes* mosquitoes, notably *Aedes aegypti*, are the primary vectors, breeding in stagnant water, predominantly in urban areas. Travelers can import the virus to non-endemic regions, sparking local outbreaks. Prevention of dengue includes mosquito control, personal protection, community engagement, and vaccination where available. The global impact of dengue is immense, affecting over 100 countries and endangering half the world's population. Annual average infections reach 390 million with about 25,000 deaths. Dengue fever is a consistent health issue in Bangladesh and has multifaceted impacts on the healthcare system, economy, and daily life of its people. Ongoing research, public health measures, and effective vaccine development are essential to mitigate this mosquito-borne threat and safeguard global communities.

Keywords: Bangladesh, dengue fever, etiology, symptoms, treatments, *Aedes aegypti, Aedes albopictus*

Cite this article as: *Ullah, M.I., Rafiqualla, I.M., Zaman, M.S. 2023, Transmission, Symptoms, Treatment and Prevention of Dengue Fever: A Formidable Healthcare Challenge in Bangladesh, Bangla J. Interdisciplinary Sci., 1 (2): 41-50.*

ডেঙ্গু জ্বরের সংক্রমণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ: বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবায় একটি ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ

সারাংশ

ডেঙ্গু জ্বর, ডেঙ্গু ভাইরাস সৃষ্ট এবং এডিস মশা দ্বারা সংক্রামিত একটি রোগ। এটি বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে ডেঙ্গু জ্বর প্রধানত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য একটি জনস্বাস্থ্যগত হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। এই ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপ আছে, DENV-1, DENV-2, DENV-3, এবং DENV-4। এরা মূলত পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। সংক্রমণের ৪ থেকে ১০ দিন পরে অসুখের লক্ষণগুলি দেখা দেয় এবং এতে উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর, তীব্র মাথাব্যথা, পেশিতে ব্যথা, ত্বকে ফুসকুড়ি এবং হালকা রক্তপাত হতে পারে। যদিও ডেঙ্গু জ্বর সাধারণত প্রাণঘাতী নয় , জটিলতা দেখা দিলে এটি ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার (DHF) এবং ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম (DSS) এর মতো মারাত্মক প্রাণঘাতী আকার ধারণ করতে পারে। অভ্যন্তরীণ রক্তপাত এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের কার্যকারিতা হারানোর কারণে DHF এবং DSS-এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। এডিস (*Aedes*) মশা, বিশেষ করে এডিস এজেপটি (*Aedes aegypti*) মশা, এই ভাইরাসের প্রাথমিক বাহক। এই মশা প্রধানত শহরাঞ্চলে স্থির পানিতে ডিম পাড়ে এবং বংশবৃদ্ধি করে। তবে মানুষ ভ্রমণের মাধ্যমে এ রোগটি সংক্রমিত এলাকা থেকে অসংক্রমিত এলাকায় ছড়িয়ে দিতে পারে। ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায় গুলির মধ্যে রয়েছে মশা নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষা, সামাজিক উদ্যোগ এবং টিকার ব্যবহার। ডেঙ্গুর বিশ্বব্যাপী প্রভাব অপরিসীম, এটা ১০০ টিরও বেশি দেশ এবং বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যার স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে। বর্তমানে ডেঙ্গুর বার্ষিক গড় সংক্রমণ প্রায় ৩৯০ মিলিয়নে পৌঁছেছে, যা প্রায় ২৫,০০০ জন মানুষের মৃত্যু ঘটায়। বাংলাদেশে ডেঙ্গু জ্বর একটি বিশাল স্বাস্থ্য সমস্যা। জনগণের দৈনন্দিন জীবন, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনীতিতে এর বহুমুখী প্রভাব রয়েছে। স্বাস্থ্য-সচেতনতা, উপযুক্ত চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, এবং ভ্যাকসিন উন্নয়নে চলমান গবেষণা এই রোগের হুমকিকে নিয়ন্ত্রণ এবং বিশ্বব্যাপী গণস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য।

মূলশব্দগুলি: বাংলাদেশ, ডেঙ্গু জ্বর, রোগের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, এডিস এজেপটি, এডিস অ্যালবোপিকটাস।

ভূমিকা

ডেঙ্গু জ্বর একটি ভাইরাস জনিত অসুখ। ডেঙ্গু ভাইরাস (Dengue virus) এডিস মশার মাধ্যমে এক জন থেকে অন্যজনের দেহে সংক্রমিত হয়। সাধারণত ট্রপিকাল অঞ্চলে, যেখানে বৃষ্টি ও আর্দ্রতা বেশি, সেখানে প্রধানত বর্ষাকালে ডেঙ্গু বহনকারী মশার আক্রমণ বেশি দেখা যায়। যদিও বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ডেঙ্গু সংক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করে না, তবুও সারা পৃথিবী জুড়ে এর প্রভাব রয়েছে। এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে ধরা হয়। বাংলাদেশে ডেঙ্গু একটি এনডেমিক রোগ যার প্রকোপ প্রধানত গ্রীষ্মকালে প্রকাশ পায়। ইদানিং কালে বাংলাদেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। চিকিৎসা ব্যাবস্থাপনার উন্নতির কারণে অতীতে সার্বিক মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও সম্প্রতি অতিরিক্ত সংক্রমণের কারণে সমষ্টিগত মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। গত ১৬ বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী (২০০৮-২০২২) প্রতিবছর জুলাই ও আগস্ট মাসে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ও মৃত্যুহার দুটোই ঊর্ধ্বমুখী থাকে (Bhowmik, 2023)। অর্থাৎ বর্ষাকালের ঠিক পরপরই পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। জনসংখ্যার ঘনবসতি, অপর্যাপ্ত বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা, মশা নিয়ন্ত্রণে সফল না হওয়া ও সাধারণ জনগণের অসচেনতা এর জন্য দায়ী (Haider, et al. 2023)। এ বছর পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার নিয়েছে এবং হাসপাতালগুলোতে রোগীর উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। মোট ডেঙ্গু রোগী ও মৃত্যু সংখ্যা ২০১৯ সালের সর্বোচ্চ রেকর্ডকেও হার মানিয়েছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১,০০০ জনেরও বেশি মানুষ এই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে (Wionews, 2023)। তবে প্রকৃত সংখ্যা সম্ভবত এর চেয়ে আরো বেশি হবে। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে ডেঙ্গু নিরাময়ের কোনো কার্যকর ওষুধ নেই| আর বর্তমানে বাজারে প্রাপ্য টিকা (vaccine) পুরোপুরি নিরাপদ এবং কার্যকর নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই টিকা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং শারীরিক জটিলতা বাড়ায় (Khetarpal and Khanna, 2016)। এই প্রবন্ধে ডেঙ্গু রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, উপসর্গ, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ডেঙ্গু জ্বর

ডেঙ্গু জ্বর একটি ভাইরাসজনিত মশাবাহিত রোগ। ডেঙ্গু ভাইরাস একটি RNA ভাইরাস। এই ভাইরাসের বাহক স্ত্রী এডিস মশা। প্রধানত এডিস এজেপটির সংক্রমণে ডেঙ্গু জ্বর হয়। এই ফ্যামিলির অন্যান্য ভাইরাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Zika ভাইরাস, Chikungunya ভাইরাস, Yellow fever ভাইরাস ইত্যাদি।

ডেঙ্গুর ধরণ

ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি ধরণ আছে: DENV-1, DENV-2, DENV-3, এবং DENV-4। বাংলাদেশে ২০০২ সালের দিকে প্রধানত DENV-3 ধরণটির প্রাদুর্ভাব ছিল, তবে সময়ের সাথে সাথে DENV-1 এবং DENV-2 প্রজাতির ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে থাকে এবং ২০১৭ সালের দিকে এসে DENV-2 প্রধান সংক্রমণকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু ২০২১ ২০২১ সালে আবারো DENV-3 প্রজাতির সংক্রমণ বাড়তে থাকে।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ডেঙ্গুর চার ধরণই শনাক্ত হয়েছে (Kayesh, et al. 2023)। এর মাধ্যমে ডেঙ্গুর পুনঃসংক্রমণ ও অসমজাতীয় ধরণের সংক্রমণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এতে করে ডেঙ্গু রোগীর রোগ প্রতিরোধজনিত জটিলতা, যেমন অ্যান্টিবডি ডিপেনডেন্ট এনহান্সমেন্ট (ADE) এর সম্ভাবনা বাড়ছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগের জটিলতার কারণে বর্তমানের চেয়েও ব্যাপক সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে।

ডেঙ্গুর উপসর্গ

ডেঙ্গু জ্বর ১০৪° ফারেনহাইট বা আরও বেশি হতে পারে। জ্বরের সাথে মাথাব্যাথা, বমি এবং অস্থি সন্ধিতে ব্যাথা থাকতে পারে। সাধারণত তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বর ভালো হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর সামান্য উন্নতির পরে পরিস্থিতি আবার খারাপ হতে পারে। বিশেষ করে যারা দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন, তাদের ক্ষেত্রে জটিলতার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ডাক্তারি ভাষায় এটাকে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার (DHF) বা ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম (DSS) বলা হয়ে থাকে। এ সময় রক্তে অনুচক্রিকা (platelet) কমে যাওয়ায় শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তপাত হতে পারে, এমন কি ব্লাড প্রেশারও কমে যেতে পারে। অনেক রোগী জ্বর এবং পাতলা পায়খানা জনিত সমস্যা নিয়েও প্রাথমিক ভাবে আক্রান্ত হতে পারে।

ডেঙ্গুর সংক্রমণ পদ্ধতি

ডেঙ্গুর সংক্রমণ প্রধানত দুটি প্রজাতির (*Aedes aegypti* and *Aedes albopictus*) মশার মাধ্যমে ছড়ায়। তবে ডেঙ্গুর সংক্রমণে *Aedes aegypti* প্রধান ভেক্টর হিসেবে কাজ করে কারণ এই প্রজাতির মশা সব রকম পরিবেশের সাথে বেশ মানিয়ে চলতে পারে। এরা ছোট পাত্র, ফুলের টব, কিংবা টায়ারের মধ্যে জমে থাকা পানিতে এবং অন্য যে কোন আবদ্ধ পানিতে ডিম পেড়ে বংশ বিস্তার করতে পারে (চিত্র-১)।

চিত্র-১: আবদ্ধ পানিতে মশার প্রজনন ক্ষেত্র, ঢাকা, বাংলাদেশ (Credit: Getty Images, 2019)

ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমিত রোগীর রক্ত শোষণের পরে মশার মধ্য-অন্ত্রের এপিথেলিয়াল কোষগুলিকে সংক্রামিত করে। তারপরে মশার অন্ত্রে ইনকিউবেশনের পর ভাইরাসের প্রতিলিপি তৈরি শুরু হয়, এবং

অবশেষে এরা মশার লালা গ্রন্থিগুলিতে জমা হয়। যখন ডেঙ্গু সংক্রামিত মশা একটি সুস্থ মানুষের রক্ত শোষণ করে, তখন মশার লালাগ্রন্থি থেকে ভাইরাস সুস্থ মানুষের রক্তে প্রবেশ করে। মানুষের রক্তে প্রবেশের পর, ভাইরাস রক্তনালীর এন্ডোথেলিয়াল কোষগুলিকে আক্রান্ত করে এবং সেখানে ভাইরাসের প্রতিলিপি তৈরি শুরু হয়। রক্তপ্রবাহে ভাইরাসের উপস্থিতি (viremia) মানুষের দেহে ইমিউন রেসপন্স (immune response) ঘটায়। ফলে মানব দেহ ইমিউন সিস্টেম সাইটোকাইন (cytokine) এবং অন্যান্য প্রতিরোধ মলিকিউল তৈরি করে; যার প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলি ভাইরাস আক্রান্ত রোগীতে প্রকাশ পায়। এই ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে কামড়ানোর মাধ্যমে অসংক্রমিত মশা সংক্রমিত হয় এবং আরেকজন সুস্থ মানুষকে কামড়ানোর মাধ্যমে সংক্রমণ চক্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। যদি সংক্রমিত ব্যক্তির গুরুতর উপসর্গ থাকে এবং রক্তে ভাইরাসের পরিমাণ অত্যধিক হয়, তবে তা এই ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

ডেঙ্গুর প্রাথমিক উপসর্গ

ডেঙ্গুর প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হলো আকস্মিকভাবে শুরু হওয়া উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর, যা প্রায়শই ১০৪° ফারেনহাইট (৪০° সেন্টিগ্রেড) পর্যন্ত পৌঁছায়। জ্বরের সাথে সাথে মাথার সামনের দিকে তীব্র মাথাব্যথা হতে পারে, যাকে কখনও কখনও "ব্রেকবোন ফিভার" হিসাবে বর্ণনা করা হয়। অস্থি-সন্ধি এবং মাংস পেশিতেও ব্যথা হতে পারে। এর ফলে রোগীর উল্লেখযোগ্য অস্বস্তি হতে পারে। জ্বর শুরু হওয়ার কয়েক দিন পরে গায়ের বিভিন্ন স্থানে ফুসকুড়ি হতে পারে। এটি দেখতে সাধারণত লালচে ঘামাচির (maculopapular rash) মতো হয়; এতে চুলকানিও হতে পারে। অনেক ডেঙ্গু রোগী বমির ভাব অনুভব করে এবং কারো কারো তীব্র বমি হতে পারে; যা শরীরে পানি শূন্যতা (dehydration) তৈরি করতে পারে। রোগের তীব্র পর্যায়ে চরম ক্লান্তিবোধ হতে পারে। কিছু রোগীর নাক বা মাড়ি থেকে হালকা রক্তপাত হতে পারে। এটি লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর প্রভাব মৃদু থাকে। তবে যারা পূর্বে একটি ভিন্ন ডেঙ্গু সেরোটাইপে সংক্রামিত হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে গুরুতর জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ডেঙ্গুর জটিলতার লক্ষণ

ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার এবং ডেঙ্গু শক সিনড্রোম (Dengue hemorrhagic fever, Dengue shock syndrome) এই রোগের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণসংশয়কারী জটিলতার মধ্যে অন্যতম। এই দুই জটিলতায় তীব্র পেটে ব্যথা হতে পারে। এর সাথে ঘন ঘন বমিও হতে পারে। যদি বমি ক্রমাগত এবং তীব্রতর হয়, তবে এটি শরীরে পানি শূন্যতা (dehydration) তৈরি করতে পারে। এ ছাড়া রক্তে অনুচক্রিকার পরিমাণ কমে যাওয়ায় নাক বা মাড়ি থেকে রক্তপাত হতে পারে। একই সঙ্গে বমি, প্রস্রাব বা পায়খানার সাথেও রক্ত যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে অতিরিক্ত অস্থিরতা বা বিরক্তিভাব দেখা যেতে পারে। দুর্বল এবং দ্রুত হৃদস্পন্দন (tachycardia) সহ দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ডেঙ্গু শক সিনড্রোম (DSS)-এর অন্যতম লক্ষণ। রোগের এক পর্যায়ে ত্বক ঠান্ডা এবং ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত পানিশূন্যতা হলে প্রস্রাবের পরিমাণও কমে যেতে পারে (oliguria); যা কিডনি বিকল হওয়ার পূর্ব লক্ষণ। রোগ অতি জটিল আকার ধারণ করলে রোগী অনেক ক্ষেত্রে অচেতন হয়ে যেতে পারে।

রোগ শনাক্তের প্রক্রিয়া (diagnostic test)

১. রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (RT-PCR): এটা একটি মলিকুলার পদ্ধতি, যা রোগীর রক্তে ভাইরাসের RNA এর উপস্থিতি শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সংক্রমণের প্রাথমিক দিনগুলিতে সবচেয়ে কার্যকর একটি প্রক্রিয়া। কেননা এ সময় ভাইরাস সক্রিয়ভাবে প্রতিলিপি করে। এই পরীক্ষাটি ডেঙ্গু ভাইরাসের নির্দিষ্ট সেরোটাইপ নির্ভুলভাবে শনাক্ত করতে পারে।

২. ডেঙ্গু ভাইরাস NS1 অ্যান্টিজেন টেস্ট: এটি একটি এনজাইম-সংযুক্ত ইমিউনোসর্বেন্ট পরীক্ষা (ELISA) যা রোগীর রক্তে অ-কাঠামোগত প্রোটিন1 (NS1) অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি সনাক্ত করে। NS1 ভাইরাস সংক্রামিত কোষ থেকে নি:সৃত হয়। ফলে অ্যান্টিবডি বিকাশের আগে একে শনাক্ত করা যায়। সংক্রমণের প্রথম দিকে এটি সবচেয়ে কার্যকর এবং দ্রুত রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে।

৩. ডেঙ্গু আইজিএম (IgM) এবং আইজিজি (IgG) অ্যান্টিবডি পরীক্ষা: এই পরীক্ষাগুলি হলো সেরোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট; যা ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিক্রিয়ার কারণে উৎপাদিত অ্যান্টিবডিগুলির উপস্থিতি শনাক্ত করে। IgM অ্যান্টিবডিগুলি সংক্রমণের কয়েক দিন পরে রক্তে উপস্থিত হয় এবং কয়েক সপ্তাহ ধরে থাকে। IgG অ্যান্টিবডিগুলি ভাইরাসের বিরূদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে।

৪. প্লাক (plaque) রিডাকশন নিউট্রালাইজেশন টেস্ট (PRNT): PRNT একটি সময়সাপেক্ষ পরীক্ষা; যা বিভিন্ন ডেঙ্গু ভাইরাস সেরোটাইপের বিরুদ্ধে neutralizing অ্যান্টিবডির মাত্রা পরিমাপ করতে পারে। এটি রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ধারণে সহায়তা করে এবং নির্দিষ্ট সেরোটাইপের পূর্ববর্তী এক্সপোজার সম্পর্কে নিশ্চিত করতে পারে।

৫. র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট (RDTs): RDTs হলো পয়েন্ট-অফ-কেয়ার টেস্ট; যা দ্রুত পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করে। এটি সাধারণত সীমিত-রিসোর্স সেটিংসে ব্যবহৃত হয়। এই পরীক্ষাগুলি রোগীর রক্তে ডেঙ্গুর অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি শনাক্ত করে। তবে তাদের সংবেদনশীলতা এবং নির্ভরতা সব সময় সমান হয় না।

৬. কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (CBC): যদিও ডেঙ্গুর জন্য এটি কোনো নির্দিষ্ট শনাক্তকারী পরীক্ষা নয়, তবুও একটি CBC টেস্ট শারীরিক অবস্থার বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে। যেমন, রক্তে অনুচক্রিকার পরিমাণ (platelet count) উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া (thrombocytopenia) ডেঙ্গু সংক্রমণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, রোগ নির্ণয়ের নির্ভুলতা রক্ত পরীক্ষার সময় (সংক্রমণের প্রাথমিক বা পরবর্তী পর্যায়), পরীক্ষাগারের গুণমান এবং ব্যবহৃত নির্দিষ্ট পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে। রোগের উপসর্গ এবং বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষার সমন্বয়ে একজন চিকিৎসক রোগীর রোগ সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে পারেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি

ডেঙ্গুর জন্য কোনো নির্দিষ্ট অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা নেই। তবে যত্ন সহকারে রোগীর শারীরিক পরিচর্যা রোগের জটিলতা প্রতিরোধে সহায়তা করে। পানিশূন্যতা প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তরল পানীয় গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে উচ্চ মাত্রার জ্বর এবং বমির ক্ষেত্রে। পানিশূন্যতার তীব্রতার উপর ভিত্তি করে মুখে খাওয়ার স্যালাইন বা শিরার মাধ্যমে স্যালাইন (intravenous fluid) দেওয়া যেতে পারে। ব্যথা উপশমকারী ওষুধ যেমন অ্যাসিটামিনোফেন (প্যারাসিটামল) জ্বর কমাতে এবং গায়ের ব্যথা কমাতে কার্যকর। আইবুপ্রোফেনের মতো নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ (NSAIDs) এড়ানো উচিত। কারণ তারা রক্তপাতের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। বিশ্রাম এবং পর্যাপ্ত ঘুমও চিকিৎসার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুতর ডেঙ্গুর লক্ষণযুক্ত রোগীদের বা যাদের জটিলতা হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে তাদের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে রোগের জটিলতার লক্ষণ, রক্তচাপ, রক্তে হিমোগ্লোবিন ও অনুচক্রিকার পরিমাণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা অপরিহার্য। যে রোগীদের ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার (DHF) বা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম (DSS) এর মতো জটিলতা দেখা দেয় তাদের জন্য আরও উচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসা ও যত্ন প্রয়োজন।

রক্তে অনুচক্রিকার পরিমাণ অতিমাত্রায় কমে গেলে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে অনুচক্রিকা প্রতিস্থাপনের (platelet transfusion) ব্যবস্থা করতে হবে। রক্তপাতের ফলে যদি হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়, তবে রক্ত প্রতিস্থাপন (blood transfusion) করতে হবে। শরীরে তরলের ভারসাম্যতা বজায় রাখতে এবং শক প্রতিরোধ করার জন্য উপযুক্তভাবে দেহে তরলের প্রতিস্থাপন করতে হবে। রোগীর অবস্থা বেশি খারাপ হলে নিবিড় পরিচর্যার জন্য তাকে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে (ICU) ভর্তি করতে হবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ

১. মশা নিয়ন্ত্রণ

- **মশার প্রজনন স্থানগুলি নির্মূল করা:** মশা বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে। তাই বাড়ির আশেপাশে সম্ভাব্য মশার প্রজনন স্থানগুলি যেমন, ফেলে দেওয়া টায়ার, ফুলের টব, সাধারণ পাত্র, নর্দমা, কিংবা ডোবা অর্থাৎ যেখানে পানি জমে স্থির হয়ে থাকতে পারে, তা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ও পরিষ্কারের মাধমে নির্মূল করতে হবে।
- **পানি সংরক্ষণের পাত্রগুলিকে ঢেকে রাখা:** বাড়ির পানি সংরক্ষণের পাত্রগুলিকে ঢেকে রাখতে হবে যাতে মশা সেখানে ডিম পাড়তে না পারে।
- **লার্ভিসাইড ব্যবহার:** মশা উপদ্রুত এলাকায় লার্ভিসাইড ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যা বদ্ধ পানিতে মশার লার্ভা মেরে ফেলতে পারে।
- **মশারি ও পর্দা ব্যবহার:** মশারির নিচে ঘুমানো এবং মশা যাতে সহজে বাসস্থানে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য জানালা ও দরজার পর্দা ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা

- **প্রতিরক্ষামূলক পোশাক:** যে সময়গুলোতে মশার উপদ্রব বেশি থাকে, যেমন ভোর এবং সন্ধ্যাবেলা, সে সময়গুলোতে লম্বাহাতা শার্ট, লম্বা প্যান্ট, মোজা এবং জুতা ব্যাবহার করা যেতে পারে।
- **মশা রেপেলেন্ট-এর বাবহার:** উন্মুক্ত ত্বক এবং পোশাকে রেপেলেন্ট বাবহার করা যেতে পারে।

৩. কমিউনিটির অংশগ্রহণ

- **এলাকাভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা প্রচারাভিযান:** সম্ভাব্য মশার প্রজনন স্থানগুলি চিহ্নিত করা এবং তা পরিষ্কার রাখতে জনসচেতনতা তৈরি করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় এমন প্রচারণামূলক কর্মসূচি ডেঙ্গু প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা বৃদ্ধি:** বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ডেঙ্গুর প্রভাব এবং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৪. **ভ্রমণ সতর্কতা:** ডেঙ্গু-এনডেমিক এলাকায় ভ্রমণ করতে হলে ডেঙ্গু সংক্রান্ত স্থানীয় সুপারিশগুলি মেনে চলা বাঞ্ছনীয়।

৫. ডেঙ্গু ভ্যাকসিন: ডেঙ্গু ভ্যাকসিন সংক্রমণের বিরুদ্ধে আংশিক সুরক্ষা প্রদান করে এবং বর্তমানে এই ভ্যাকসিনের অপ্রতুলতাও রয়েছে। তাই আমাদের সংক্রমণ প্রতিরক্ষার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে। বিশ্ববাজারে বর্তমানে দুই কোম্পানির ডেঙ্গু ভ্যাক্সিন পাওয়া যাচ্ছে। যথা- জাপানের তাকিদা ফার্মাসিউটক্যালসের কিউডেঙ্গা (Qdenga) এবং ফ্রান্সের সানোফির ডেঙ্গভাক্সিয়া (Dengvaxia) ভ্যাক্সিন। দুটো ভ্যাক্সিনকেই ডেঙ্গুর চার সেরোটাইপগুলির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তবে ভ্যাক্সিন দুটির ব্যাকবোন (কাঠামো) আলাদা হওয়ার কারণে প্রতিরোধক্ষমতা ও ইমিউন জটিলতার ধরণও আলাদা (Thomas, 2023)। তবে ভ্যাক্সিন দুটির দাম বেশ বেশি হওয়ায় এটি সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশি এবং আমেরিকান বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় একটি নতুন ডেঙ্গু ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে যার প্রথম ডোজের নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতার (safety and immunogenicity) আংশিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বাংলাদেশে ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে (Walsh, et al., 2023)।

৬. অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা

- লার্ভা ধ্বংসকারী রাসায়নিকগুলি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তাছাড়া লার্ভা অল্পকিছু দিনের মধ্যে রাসায়নিক প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। ফলে তা আর পুরো মাত্রায় কার্যকরী থাকে না। গবেষণায় জানা যায় *Bacillus thuringiensis* সংক্ষেপে বিটি (Bt) নামক ব্যাকটেরিয়া মশার লার্ভা ধ্বংসকারী (larvicide) হিসেবে কাজ করে। এটা পরিবেশ সহায়ক (Sukesi, et al. 2019) এবং এটা দেশীয় প্রযুক্তিতে দেশেই উৎপাদন করা যায় (Shishir, et al. 2014)।

- মশা বন্ধ্যাকরণ প্রযুক্তি (Sterile Insect Technique বা SIT) প্রয়োগ করে বিশ্বের অনেক দেশ সাফল্য পেয়েছে যদিও পরিবেশের উপর এর প্রভাব সুস্পষ্ট নয় (Oliva, et al., 2021)।
- উলবাকিয়া (*Wolbachia*) নামক ব্যাকটেরিয়া বহনকারী মশা ডেঙ্গু প্রতিরোধী বলে জানা যায় (Zhang and Lui, 2020)। এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গবেষণার দাবি রাখে।

উপসংহার

ডেঙ্গু প্রতিরোধের মৌলিক অংশ হলো ডেঙ্গু ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষিত রাখা যা ব্যক্তিগত, সামাজিক, এবং সরকারি সহযোগিতার ফলে সম্ভব হতে পারে। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত প্রয়াস, জনগণের সমষ্টিগত অংশগ্রহণ, এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডেঙ্গু সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি অনুসরণ করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডেঙ্গু সংক্রমণের ঝুঁকি এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব কমানো যেতে পারে।

ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব কমানোর জন্য ১৯৯৩ সালে ফিলিপাইনের সরকার কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেয় এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। । এর মধ্যে রয়েছে নতুন ডেঙ্গু রোগী এবং মশা বৃদ্ধির উপরে নজরদারি (surveillance), ডেঙ্গুর যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, রোগ মহামারী নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি, এবং ডেঙ্গু নির্ণয় ও প্রতিকারে জোরদার গবেষণা কার্যক্রম (Ong, et al., 2022)।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য বিভাগের (Directorate General of Health Services) নির্দেশনায় ডেঙ্গু রোগীর সুষ্ঠু সুচিকিৎসায় Pocket Guideline for Dengue Clinical Case Management 2022 (Revised) প্রকাশিত হয়েছে (DGHS, 2022)। এটা ডেঙ্গু চিকিৎসায় অনভিজ্ঞ বা স্বল্প-অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের যথাযথ চিকিৎসা দিতে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিগত ও সমন্বিত সামাজিক সচেতনতার বিকল্প নেই। জনসাধারণের পরিবেশ সচেতনতা, রোগ শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সহজ লভ্যতা, এবং সরকারি পর্যায়ে মশা ও লার্ভা ধ্বংসের মাধ্যমে ডেঙ্গুকে কার্যকরী ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

তথ্যসূত্র

Bhowmik, K.K, Ferdous J, Baral PK, Islam MS. 2023, Recent outbreak of dengue in Bangladesh: A threat to public health, Health sci. reports, 6(4): e1210. Doi: 10.1002/hsr2.1210

DGHS. 2022, Pocket Guideline for Dengue Clinical Case Management 2022 (Revised), https://dghs.gov.bd/sites/default/files/files/dghs.portal.gov.bd/notices/a8e060dd_9be8_4a56_ae81_8dd148583c86/2023-05-25-04-327a03848c72b1451e6d94e0c04edf483d.pdf (accessed August 14 2023)

Getty Images. 2019, Dengue Fever in Dhaka. https://www.gettyimages.ie/detail/news-photo/water-gathered-in-dhaka-has-become-a-breeding-ground-of-news-photo/1159150055

Haider, N, Hasan M.N, Khalil I, et al. 2023, The 2022 dengue outbreak in Bangladesh: hypotheses for the late resurgence of cases and fatalities, J. Med. Entomol., 60 (4): 847-52. 3, Doi: 10.1093/jme/tjad057

Kayesh, M.E.H, Khalil I, Kohara M, Tsukiyama-Kohara K. 2023, Increasing Dengue Burden and Severe Dengue Risk in Bangladesh: An Overview, Tropical Med. Infect. Dis., 8 (1): 32, Doi: 10.3390/tropicalmed8010032

Khetarpal, N, Khanna I. 2016, Dengue Fever: Causes, Complications, and Vaccine Strategies. Journal of immunology research, Doi: 10.1155/2016/6803098

Oliva, C.F, Benedict M.Q, Collins C.M, et al. 2021, Sterile Insect Technique (SIT) against Aedes Species Mosquitoes: A Roadmap and Good Practice Framework for Designing, Implementing and Evaluating Pilot Field Trials, Insects 12 (3): 191, Doi: 10.3390/insects12030191

Ong, E.P., Obeles, A.J.T., Ong, B.A.G., Tantengco, O.A.G. 2022, Perspective and Lessons from the Philippines Decades-Long Battle with Dengue, Lancet Reg. Health West Pac, DOI: 10.1016/j.lanwpc.2022.100505

Shishir, A, Roy, A, Islam, N, Rahman, A, Khan, S.N, Hoq, M.M. 2014, Abundance and diversity of *Bacillus thuringiensis* in Bangladesh and their cry genes profile, Front. Environ. Sci., 2-2014, Doi: https://doi.org/10.3389/fenvs.2014.00020

Sukesi, T.W, Sulistyawati, H.E, Mulasari, S.A. 2019, Effectivity of Bacterial Suspension *Bacillus thuringiensis* Var Israelensis in Killing *Aedes aegypti* L. Mosquito Larvae. Bangladesh Journal of Medical Science, 18 (4): 706-10

Thomas, S.J. 2023, Is new dengue vaccine efficacy data a relief or cause for concern? npj Vaccines, 8 (1): 55. https://www.nature.com/articles/s41541-023-00658-2

Walsh, M.R, Alam, M.S, Pierce, K.K, Alam, M, Dickson, D.M, Bak, D.M, Afreen, S, Nazib, F, et al. 2023, Safety and durable immunogenicity of the TV005 tetravalent dengue vaccine, across serotypes and age groups, in dengue-endemic Bangladesh: a randomized, controlled trial, The Lancet Infect Dis., Doi: 10.1016/S1473-3099(23)00520-0

Wionews. 2023, Bangladesh: Dengue death toll crosses 1,000-mark, https://www.wionews.com/videos/bangladesh-dengue-death-toll-crosses-1000-mark-643175

Zhang, H, Lui, R. 2020, Releasing Wolbachia-infected Aedes aegypti to prevent the spread of dengue virus: A mathematical study, Infect. Disease Modelling 5: 142-160, Doi: 10.1016/j.idm.2019.12.004

REVIEW PAPER

Climate Change and Water Security of Bangladesh

Ali Shafqat Akanda[1], Wahid Palash[2]

[1]Associate Professor, Civil and Environmental Engineering, University of Rhode Island Kingston, RI 02881, USA
[2]Water Resources Engineer, Integrated Sustainability, Calgary, AB T2P 4H2, Canada

*Corresponding Author: Ali Shafqat Akanda
Corresponding Email: akanda@uri.edu

Received: 12/27/2023 / Accepted: 1/14/2024

https://doi.org/10.5281/zenodo.10511611

ABSTRACT

Bangladesh is one of the most vulnerable countries in the world due to Climate Change. The climate, weather, and environment are intricately linked to the rivers of this deltaic riverine nation. The societal structure, economic development, and public health of the population are also completely dependent on these water resources. The world is already experiencing the adverse impacts of climate change. Bangladesh is no exception and is facing the impacts through three main pathways. These are: Water scarcity and intense droughts in the summer season, increase in rainfall intensity and worsening floods during the monsoon, and salinity intrusion and water resources contamination across the coastline due to Sea-Level Rise. These impacts have collectively put the water resources of Bangladesh and the dependent population at great risk, from the foothills of the Himalayas to the coastline of the Bay of Bengal. This essay is an effort to highlight the adverse multi-dimensional effects of climate change and the challenge of future water security and economic development in Bangladesh.

Keywords: Climate Change, Sea-level Rise, Water Security, Floods, Droughts, Salinity

Cite this article as: *Akanda, A.S., Palash, W. 2023, Climate Change and Water Security of Bangladesh, Bangla J. Interdisciplinary Sci., 1 (2): 51-62.*

জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাংলাদেশের পানিসম্পদ নিরাপত্তা

সারাংশ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ-বিপদাপন্ন দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এদেশের জলবায়ু, পানিসম্পদ, আবহাওয়া, এবং পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে এই নদীমাতৃক দেশের নদী গুলোর সাথে জড়িত। একই সাথে এই দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য এই পানিসম্পদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বর্তমানকালে সমগ্র বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের পানি সম্পদের উপর যে সব প্রতিকুল প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা হলো শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতা, মাটির শুষ্কতা, এবং অতিরিক্ত খরার প্রবনতা; বর্ষা মৌসুমে তীব্র বৃষ্টিপাত এবং বন্যা পরিস্থিতির অবনতি; এবং সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে সমগ্র বাংলাদেশ উপকূলে লবণাক্ততা এবং পানিসম্পদ দূষণ বৃদ্ধি। এই প্রভাবগুলি একত্রে হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত পানি সম্পদ এবং জনসাধারণকে বিশাল এক ঝুঁকির মধ্যে এনেছে। এই পর্যালোচনাটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ত্রিমাত্রিক প্রতিকূলতার পরিপ্রেক্ষিতে পানিসম্পদ নিরাপত্তা এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রতিকূলতার একটি চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে ।

মূলশব্দগুলি: জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, পানিসম্পদ নিরাপত্তা, পানি স্বল্পতা, বন্যা, লবণাক্ততা

ভূমিকা

বাংলাদেশ হিমালয় পর্বতমালার খুব কাছে অবস্থিত একটি নদীমাতৃক দেশ। হিমালয় পর্বত থেকে প্রবাহিত নদীর অববাহিকা নিয়ে সমুদ্রের প্রায় একই উচ্চতায় অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। এই দেশের সিংহভাগ আয়তন নিয়ে ছড়িয়ে আছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (Ganges-Brahmaputra-Meghna or GBM) নদীর বেসিন। এই নদী গুলো হিমালয়ের পাদদেশ থেকে ভারত, চীন, নেপাল, এবং ভুটানের পর্বতমালা থেকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত জনিত পানি উজান থেকে ভাটিতে নিয়ে আসে (Chowdhury et al., 2004)। বাংলাদেশের পানি নিরাপত্তা অনেকাংশে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশসমূহের উপর নির্ভরশীল (Akanda, 2012)।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৭ কোটি। এই বিশাল জনসংখ্যা তাদের ভরণপোষণ, কৃষিকাজ, শিল্প উৎপাদন, এবং পানির চাহিদা মিটানোর জন্য এই নদী সমূহের উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল (Biswas et al., 2020)। বাংলাদেশে অনেক নদী-নালা এবং সামগ্রিকভাবে অনেক পানিসম্পদ থাকার পরেও সুপেয় পানির অভাব চির বিদ্যমান (Getirana et al., 2022; Akanda, 2012)। এর অন্যতম কারণ হলো এ অঞ্চলের মৌসুমি বৃষ্টিপাত এবং নদীর পানি প্রবাহ। বাংলাদেশের কৃষিকাজ কয়েক দশক আগে পর্যন্ত প্রধানত বৃষ্টিপাত নির্ভরশীল ছিলো। আমন এবং আউশ ধানের ফলন এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। গত কয়েক দশকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে শুষ্ক মৌসুমে বোরো ধান, শাকসবজি, ও শীতকালীন রবিশস্যের উৎপাদন বহুগুন বেড়েছে। কিন্তু তা করতে গিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে সেচ-নির্ভর কৃষি ব্যবস্থায় নির্ভরশীল হয়ে উঠছে, যা মূলত ভূগর্ভস্থ পানি সেচের মাধ্যমে পূরণ করা হয় (Shamsudduha et al., 2022)। কিন্তু, শুষ্ক মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির যোগান বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের এবং নদী প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া গ্রামাঞ্চলের পুকুর, খাল-বিল, হাওর, এবং নদীনালার পানিপ্রবাহ এবং নিত্য-নিয়মিত ব্যবহারযোগ্য পানির পরিমাণ অনেকটাই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল (Getirana et al., 2022)। একই সাথে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানেই খাবার পানির চাহিদা বর্তমানে টিউবওয়েলের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে মিটানো হয় (Shamsudduha et al., 2022)।

বিশ্বখ্যাত আমাজন এবং কঙ্গো নদীর পরেই পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মিঠা পানির প্রবাহ পরিবহণ করে এই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর অববাহিকা (Akanda, 2012)। তবে এই দুটো বিশ্বখ্যাত নদীর পানি প্রবাহ সারা বছর জুড়ে প্রায় সমপরিমাণের, কিন্তু বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া পদ্মা (ভারতে যা গঙ্গা নামে পরিচিত), যমুনা (ভারতে যা ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত), ও মেঘনা নদীর পানি ভিন্ন ভাবে পরিবাহিত হয়। তীব্র মৌসুমি আবহাওয়ার কারণে এই নদীগুলোর অববাহিকাতে জুন থেকে সেপ্টেম্বর - বছরের এই চার মাস সময়ের মধ্যে সিংহভাগ (৮৫%) পানি বয়ে যায়, বাকি ১৫% পানি প্রবাহিত হয় বছরের বাকি আট মাস ধরে। মৌসুমি বৃষ্টিপাত ও নদীর প্রবাহ বছরের মাত্র ৪ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে পানি সম্পদ প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা বাংলাদেশের জন্য একটি কঠিন সংকট (Chowdhury et al., 2004)। প্রতি বছর খরা মৌসুমে পানি-স্বল্পতা এবং বর্ষা মৌসুমে বন্যা একটি বাৎসরিক ঘটনা (Palash et al. 2020)। এই কারণে বাংলাদেশের বন্যা, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে কাজ করে চলেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (Impacts of Climate Change)

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে গড় তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ৪০ বছরে দেশের সামগ্রিক তাপমাত্রা গড়ে প্রায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে (Imran et al., 2023), এবং সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রতি দশকে গড়ে ০.৩৮ এবং ০.২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। এর ফল স্বরূপ বাংলাদেশে প্রধানত তিনটি কারণে পরিবেশ এবং পানিসম্পদের উপর প্রতিকূল চাপ পড়বে। এই তিনটি কারণ হলো: (১) শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতা, মাটির শুষ্কতা, এবং অতিরিক্ত খরার প্রবনতা; (২) বর্ষা মৌসুমে তীব্র বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি এবং বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি; এবং (৩) সমুদ্রের উচ্চতা বাড়ার কারণে সমগ্র বাংলাদেশ উপকূলে লবণাক্ততা এবং পানিসম্পদ দূষণ বৃদ্ধি পাওয়া। জলবায়ু পরিবর্তনের এই ত্রিমাত্রিক প্রতিকূলতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের পানিসম্পদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র (Getirana et al., 2022)।

উপর্যুক্ত কারণগুলো একত্রে বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং জনগণের ভরণপোষণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই পানিসম্পদের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের পানি নিরাপত্তা দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশসমূহের উপর

নির্ভরশীল (চিত্র ১)। মৌসুমী জলবায়ুর কারণে শুষ্ক মৌসুমে প্রতি বছর পানি-স্বল্পতা দেখা যায়, আবার এই নদীর গুলোর অববাহিকাতে উজান থেকে বয়ে আসা পানির প্রবাহে বর্ষা মৌসুমে নিয়মিত বন্যা দুর্যোগ দেখা যায়। একই সাথে উপকুল এলাকাসমূহে শুষ্ক মৌসুমে উজানের পানি কমে যাবার কারণে সমুদ্র থেকে লবনাক্ত পানির প্রবেশ পরিবেশের উপর একটি মারাত্মক প্রতিকূল ভাব ফেলে।

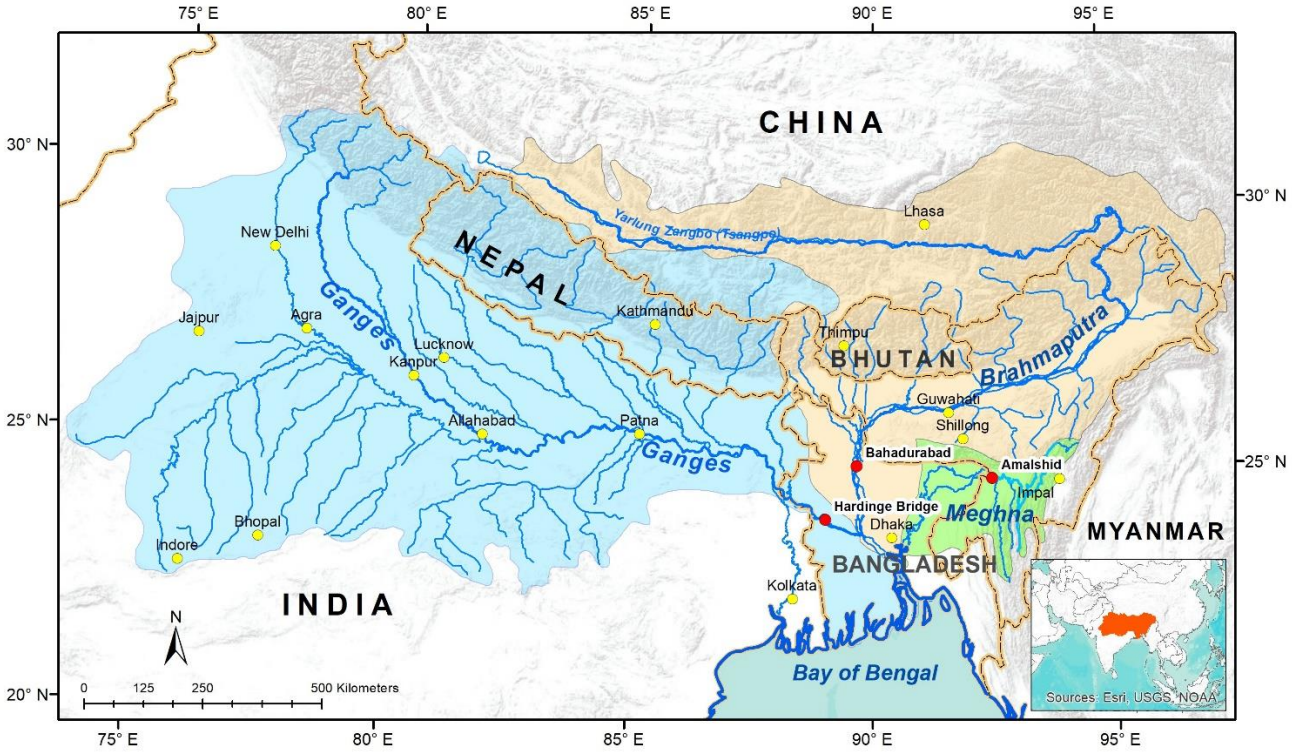

চিত্র ১: দক্ষিণ এশিয়া এবং বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহের অবস্থান

বাংলাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো এদেশের জনস্বাস্থ্য অনেকাংশেই দেশের পানিপ্রবাহের উপর নির্ভরশীল। বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের কলেরা, ডিসেন্ট্রি এবং অন্যান্য পানি বাহিত আমাশয় রোগের প্রকোপ খরা এবং বন্যার কারণে বিশেষভাবে ওঠা নামা করে (Akanda et al., 2011)। শুষ্ক মৌসুমে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির অভাবে আমাশয় রোগের তীব্র প্রকোপ দেখা যায়। আবার বর্ষা মৌসুমে দেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, এবং ঢাকার আশেপাশে নদী সংলগ্ন জেলা সমূহে বন্যার কারণে প্রচুর পরিমাণে পানি বাহিত রোগের প্রকোপ দেখা যায়। এছাড়া উপকূল এলাকাগুলোতে লবণাক্ততার কারণে প্রতিবছর একটি বিশাল এলাকা জুড়ে, বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খুলনা এবং বরিশাল বিভাগ এলাকায়, পানি সম্পদের সংকট, কলেরা রোগের প্রাদূর্ভাব, এবং জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব দেখা যায় (Akanda et al., 2018)।

একই সাথে, বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য (Sustainable Development Goals) অর্জনের পথে জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ পানি নিরাপত্তা একটি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জনস্বাস্থ্য, কৃষি

উৎপাদন, পানিসম্পদ এবং পরিবেশ বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদি লক্ষগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অনেক গবেষণা হলেও সামগ্রিকভাবে পানিসম্পদের উপর ঠিক কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সেই বিষয়ে গবেষণামূলক রচনা খুব বেশি নেই, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। তাছাড়া, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খরার প্রবণতা বৃদ্ধি, বড় ধরণের বন্যার বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন, স্থানীয় বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বৃদ্ধি, এবং তার সাথে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় এলাকায় পানিসম্পদের তীব্র সংকট এই বিষয়গুলো নিয়ে একসাথে আলোচনা পাওয়া দুষ্কর। এক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে অস্ট্রেলিয়ার Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) এবং বাংলাদেশের Institute of Water Modeling (IWM), Center for Environment and Geographic Information Services (CEGIS) সংস্থার ২০১৪-এর গবেষণাটি প্রাধান্য পেতে পারে (Kirby et al, 2014)। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশের জন্যও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিক্ষেপ (projection) অনিশ্চিত, এবং তাদের গবেষণা মতে বৃষ্টিপাতের ১৮% পর্যন্ত সম্ভাব্য বৃদ্ধি, আবার কোনো ক্ষেত্রে প্রায় ৪% হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়, যদিও বৃদ্ধির সম্ভাবনাই বেশি (Kirby et al., 2014)।

সাম্প্রতিক গবেষণা গুলোর মধ্যে বাংলাদেশের Institute of Water and Flood Management (IWFM) এবং প্রতিবেশী দেশ নেপালের International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) থেকে প্রকাশিত দুটি গবেষণা জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে যমুনা নদীর অববাহিকার উপর প্রভাব ফেলতে পারে সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছে (Imran et al., 2023, Palash et al., 2023)। আমাদের এই প্রবন্ধে কীভাবে শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতা ও অতিরিক্ত খরার প্রবণতা, বর্ষা মৌসুমে তীব্র বৃষ্টিপাত ও বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি, এবং উপকূলে লবণাক্ততা এবং পানিসম্পদ দূষণ - এই তিনটি বিষয় জড়িত এবং কীভাবে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ব্যাহত করতে পারে তার একটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতা (Water Scarcity in the Dry Season)

বাংলাদেশের বৃষ্টিপাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দেশের উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম বৃষ্টিপাত হয় (Chowdhury et al., 2004)। এদেশের মৌসুমি আবহাওয়া এবং আঞ্চলিক পরিবেশ বিশেষভাবে এই বৃষ্টিপাতের সাথে জড়িত । এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিমাঞ্চলে বাৎসরিক ১৫০০ মিলিমিটার থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৪০০০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে (Akanda, 2012)। একই সাথে, এই বৃষ্টিপাত মূলত জুন থেকে সেপ্টেম্বর - এই চার মাস সময়ের মধ্যে হয়। যার ফলে প্রধান নদীগুলোতে জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত পানিপ্রবাহ অনেক কমে যায় (চিত্র ২)। বিশেষ করে পদ্মা নদীর এলাকা সমূহ এবং উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি শুষ্ক মৌসুমে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তীব্র পানি স্বল্পতা এবং সামগ্রিক পানিসম্পদ নিরাপত্তার অভাবে ভুগে (Getirana et al., 2022)। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই শুষ্ক মৌসুমের পানি স্বল্পতা প্রতি দশকে তীব্রতর হয়ে আসছে। একই সাথে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে যেখানে লম্বা সময় কোন বৃষ্টিপাত হয় না এবং মাটি এবং পরিবেশে তীব্র পানি সংকট এবং খরায় প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয় (Hasan et al., 2018)। পদ্মা এবং

যমুনা নদীর বাৎসরিক পানিপ্রবাহ দেখলে বোঝা যায় যে শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহিত পানির পরিমান প্রতি দশকেই কমে আসছে (চিত্র ৩)।

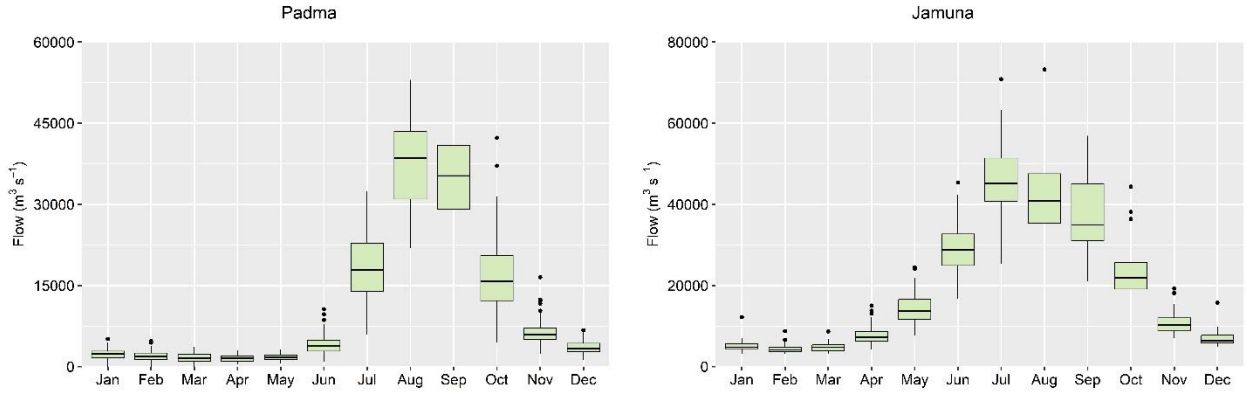

চিত্র ২: পদ্মা এবং যমুনা নদীর গড় মাসিক পানি প্রবাহের চিত্র

উষ্ণায়ন এবং বর্ধিত সম্ভাব্য বাষ্পীভবনের কারণে, সকল জলবায়ু পরিবর্তনের গাণিতিক মডেলের অভিক্ষেপ অনুযায়ী বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে অধিকতর সেচের পানির চাহিদা তৈরি হবে, যার ফলে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বেশি হবে (Getirana et al., 2022)। বিশেষ করে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমের পানির ঘাটতিজনিত সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। তাদের এই গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, শুকনো মৌসুমে ভারত কর্তৃক উজানের নদীগুলোর পানি সরিয়ে নেয়া জলবায়ু পরিবর্তনের তুলনায় বেশী প্রভাব রাখবে।

বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস নিয়ে বেশ উদ্বেগ রয়েছে। এর জন্য মূলত দায়ী করা যেতে পারে ঢাকা এবং আশেপাশের অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার এবং উত্তরে বরেন্দ্র অঞ্চলের সেচ ব্যাবস্থায় ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার। এই গবেষণায়, জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে আঞ্চলিক বৃষ্টিপাত, বাষ্পীভবন, আঞ্চলিক পানির ভারসাম্য এবং আঞ্চলিক ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের উপর প্রভাব ফেলবে তার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে (Kirby et al., 2014)। অন্য আরেকটি গবেষণায়, তারা জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে বার্ষিক নিয়মিত বন্যা পরিস্থিতিকে তীব্র (extreme) করে তুলবে তার একটি বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করেছে। একই সাথে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির উপর জলবায়ুর প্রভাব এবং উপকূলীয় অঞ্চলে তৎসংশ্লিষ্ট ভূ-পৃষ্ঠের পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটি দেশের প্রধান নদীগুলির শুষ্ক মৌসুমের পানিপ্রবাহের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলিও উপস্থাপন করেছে (Imran et al., 2023)।

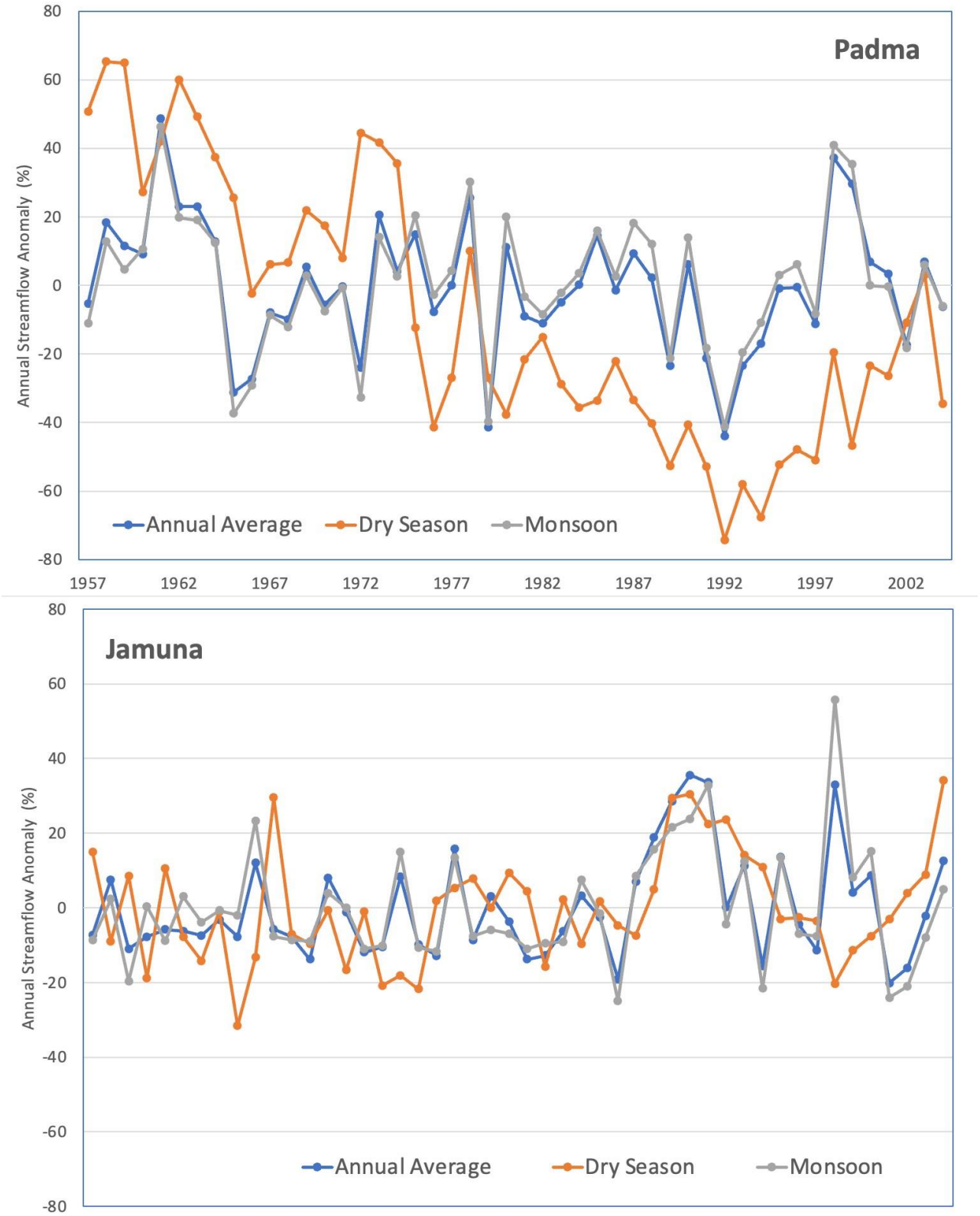

চিত্র ৩: শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে পদ্মা এবং যমুনা নদীর বাৎসরিক পানি প্রবাহের ওঠা নামা

বর্ষা মৌসুমে বন্যা দূর্যোগ (Flood Hazards in the Monsoon Season)

বন্যা বাংলাদেশের একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে প্রতিবছর মৌসুমি বৃষ্টিপাতের কারণে নদী-নালা এবং অন্যান্য জলাশয় সম্পূর্ণভাবে পানিতে ভরে যায় এবং প্রায় বছরেই বন্যা পরিস্থিতির তৈরি হয় (Palash et al., 2020)। এই বন্যা শুধু স্থানীয় বৃষ্টিপাতের কারণে পরিলক্ষিত হয় না। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল, ও ভুটান থেকে পরিবাহিত নদীগুলো উজানের অববাহিকা থেকে বঙ্গোপসাগরে বর্ষার মৌসুমি বৃষ্টিপাত বয়ে নিয়ে আসে (Akanda, 2012)।

জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদীতে (বাংলাদেশে যমুনা নামে পরিচিত) এবং জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পদ্মা নদীতে বর্ষা কালে অতিরিক্ত পানি প্রবাহ হয়ে থাকে (Palash et al., 2018)। বছরের এই সময়ে প্রায়সই এই নদীগুলোর কুল উপচে পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহে বন্যা দুর্যোগের সৃষ্টি করে। এছাড়া খরা মৌসুমে জমে ওঠা পলির কারণে এই নদীর অববাহিকাগুলোতে যে সমস্ত চর গঠিত হয়, তা বর্ষাকালীন সময়ে সঠিকভাবে পানি প্রবাহ ব্যাহত করে এবং বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় (Palash et al., 2020)।

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বন্যা দুর্যোগ দেখা যায় ১৯৫৪, ১৯৫৫, এবং সাম্প্রতিক সময়ে ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, এবং ২০০৭ সালে। এই বছরগুলোতে দেশের সিংহভাগ জেলা সমূহ বন্যা কবলিত হয়, কোনো কোনো অঞ্চল পানি কবলিত হয়ে মাসাধিক সময় পার করে, এবং অসংখ্য মানুষ বন্যা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশেষ করে ১৯৮৮ সালে ঢাকা শহর সম্পূর্ণভাবে পানির নিচে তলিয়ে যায়। যে কারণে পরবর্তীতে ঢাকা শহর ঘিরে শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই শহর রক্ষা বাঁধ ২০০৪, ২০০৭, এবং ২০১৭ সালে তীব্র বন্যা হওয়ার পরেও ঢাকা শহরকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের এই নিয়মিত বন্যা দুর্যোগের চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হতে শুরু করেছে (Imran et al., 2022)। গত ৫০ থেকে ৭০ বছরের পানি প্রবাহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক দশক গুলোতে বন্যার সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র - ৩)। যেখানে আগে প্রতি দশকে একটি বড় বন্যা আশঙ্কা করা হতো, সেখানে সাম্প্রতিককালে প্রতি তিন থেকে চার বছরে একই রকম বড় বন্যা দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে (Palash et al., 2020)। একই সাথে মৌসুমি বৃষ্টির তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলস্বরূপ খুব সল্প সময়ের বৃষ্টিপাতের কারণেও উজান থেকে বয়ে আসা পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি স্থানীয় বন্যার আশঙ্কা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (Kirby et al., 2014)। মোটাদাগে, সামগ্রিক ভাবে বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে বয়ে আসা পানির পরিমাণে পরিবর্তন না হলেও তীব্র বৃষ্টির কারণে দেশে খুব দ্রুত এবং ঘন ঘন বন্যা পরিস্থিতির আগমন হচ্ছে।

এক সাম্প্রতিক গবেষণায় (Imran et al., 2023) দেখা গেছে যে ২০৩০ থেকে ২০৫০ সাল নাগাদ সামগ্রিক বাৎসরিক বৃষ্টিপাত প্রতি দশকে প্রায় ২২৫ মিলিমিটার বেড়ে যেতে পারে। একই সাথে দক্ষিণের উপকূলীয় জেলা সমূহের ভারী বৃষ্টিপাতের দিন (এক দিনের মধ্যে ২০ মিলিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত) প্রতি দশকে প্রায় ২.২৫ দিন বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, সামগ্রিকভাবে পুরো বাংলাদেশের নদ-নদী এবং জলাশয় সমূহে আট থেকে ১২ শতাংশ পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে (Kirby et al., 2014)। জলবায়ু পরিবর্তনের উপরোক্ত কারণগুলো বাংলাদেশের জন্য একটি মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সাথে এটাও লক্ষণীয় যে মৌসুমি বৃষ্টির তীব্রতা পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং

অন্যান্য স্থানীয় সংস্থার জন্য বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ পদক্ষেপগুলো নেয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। এর ফলাফল স্বরূপ বাংলাদেশে বন্যার কারণে দুর্যোগ এবং জনগণের বন্যা প্রকোপ জনিত ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ প্রতিবছরই বেড়ে চলেছে।

উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (Sea-level Rise in Coastal Areas)

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের আরেকটি মারাত্মক সমস্যা হলো উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে ওঠা এবং দক্ষিণের জেলাগুলোতে পানিসম্পদের দূষণ বৃদ্ধি। এই রচনার আগের অংশে বলা হয়েছে যে, শুষ্ক মৌসুমে উজান থেকে বয়ে আসা নদীগুলোতে পানির পরিমাণ আশঙ্কাজনক ভাবে কমে গেছে (Akanda, 2012)। ভারত থেকে বয়ে আসা পদ্মা নদীতে ফারাক্কা বাঁধের কারণে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ যখন অতিরিক্ত মাত্রায় কমে যায়, তখন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম প্রধান নদী গড়াই এবং মধুমতি নদীতে খুব অল্প পরিমাণ পানি প্রবেশ করতে পারে (Babel and Wahid, 2011)। আর উজান থেকে বয়ে আসা মিষ্টি পানির প্রবাহ কমার কারণে উপকূলীয় জেলা সমূহে ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত সমুদ্রের লবণাক্ত পানি প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ভেতরে প্রবেশ করে থাকে। এই সময়ে উপকূলের বিভিন্ন জলাশয়, নদী এবং অন্যান্য পানি সম্পদে লবণাক্ততার প্রভাব পড়ে এবং মিষ্টি পানির অভাব পরিলক্ষিত হয় (Getirana et al., 2022)।

বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততার সমস্যা মূলত দুই ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। (১) শুষ্ক মৌসুমে উজান থেকে বয়ে আসা নদীগুলোতে পানি প্রবাহ কমে আসার কারণে সমুদ্র থেকে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছে, (২) সমুদ্র স্তর বেড়ে ওঠার কারণে এই লবণাক্ত পানি নদীর অববাহিকাগুলোতে আরো গভীরে প্রবেশ করছে। এই দুটি কারণ মিলিয়ে উপকূলের এক বিস্তীর্ণ এলাকার পৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ পানি - উভয় সম্পদ-ই লবণাক্ততার প্রভাবে দূষিত হচ্ছে। বছরের এই মাসগুলোতে দক্ষিণাঞ্চলের নদীর পানি এবং নদীর আশেপাশের জলাশয়ের পানি, এমন কি ভূগর্ভস্থ পানি পানের অযোগ্য হয়ে ওঠে (Akanda et al., 2018)। একই সাথে, চাষবাস, পৌরসভার পানি সরবরাহ বা অন্যান্য কাজে এই লবনাক্ত পানি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে ওঠে (Getirana et al., 2022)।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন উপকূল সমূহে বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের উপকূল এলাকাতে প্রতিবছরে ৪ মিলিমিটার অথবা এই শতাব্দীর শেষনাগাদ প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে পারে (Sreeraj et al., 2022)। আপাতদৃষ্টিতে এই ৪০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি নগণ্য মনে হলেও সামগ্রিকভাবে এই পরিমাণ সমুদ্রস্তর বৃদ্ধি এই এলাকার জন্য আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়াবে। IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), যা জাতিসংঘের একটি অঙ্গসংগঠন, এবং বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষা অনুযায়ী ২১০০ সাল নাগাদ প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার সমুদ্র স্তর বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের প্রায় ১৭.৫% ভূখণ্ড সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যেতে পারে (World Bank, 2011)।

দেশের দক্ষিণাচলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জমির অবনমন (subsidence) এবং সংকোচন (compaction) বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। জলবায়ু এবং দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের দক্ষিণ বা

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও তৎসংশ্লিষ্ট লবনাক্ততা নিয়ে যতোটা আলোচনা হয়, এই অঞ্চলের জমির অবনমন এবং সংকোচন নিয়ে তা হয় না। Steckler et al. (2022) তাদের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ করেছেন যে, হ্যান্ড-ড্রিল করা নলকূপগুলো বছরে প্রায় ১-৫ মিলিমিটার, নদীর তলদেশ মাপার গেজগুলো ৪-৮ মিলিমিটার, এবং ভূগর্ভস্থ তল মাপার কূপ (Borehole) গুলো ৯-১০ মিলিমিটার পর্যন্ত অবনমন এবং সংকোচন হচ্ছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের বৃদ্ধির হারের থেকে দুই থেকে তিন গুন বেশি। আশংকা রয়েছে যে ভবিষ্যৎ দশকগুলোতে বাংলাদেশের দক্ষিণাচলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মাটি অবনমন এবং সংকোচনের একটি সামগ্রিক প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে।

উপকূলের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নদীর লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে, নদীর আশেপাশের জলাশয় সমূহে পানি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়বে, এবং একটি বড় জনসংখ্যার জন্য মিঠা পানির তীব্র সংকট দেখা দিবে (Babel and Wahid, 2011)। একই সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষিকাজ এবং মাছ চাষে পানি সরবরাহ ব্যাহত হবে। বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশের ক্ষেত্রে এই ৪০ সেন্টিমিটার সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কোটি মানুষের চাষাবাদ, মিঠা পানির উৎস, এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াবে (Getirana et al., 2022)।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, আশঙ্কা করা যায় যে ঘূর্ণিঝড় এবং অন্যান্য উপকূলীয় ঝড়ের প্রভাব আরো বেশি পরিলক্ষিত হবে। দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলীয় জেলাসমূহে ২০০৭, ২০০৯, এবং ২০২৩ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডর (Sidr), আইলা (Aila), এবং মোকা (Mocha) - এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি লবণাক্ত পানির প্রভাবে এবং ঝড়ের কারণে অনেক উপকূলীয় জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র উপকূলীয় এবং ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশ এবং জনসাধারণের ক্ষতি আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিভিন্ন গবেষণা প্রকাশনা (Sarkar et al., 2021)।

উপসংহার (Conclusion)

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশের পরিবেশে ইতোমধ্যেই স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। সামগ্রিক তাপমাত্রা গত ৪০ বছরে গড়ে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগামীতে প্রতি দশকে ০.২৩ থেকে ০.৩৮ ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে। গত ৫০ বছরের জলবায়ু এবং আবহাওয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শুষ্ক মৌসুমে খরার প্রবণতা এবং তীক্ষ্মতা, এবং একই সাথে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির তীব্রতা এবং বন্যার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমগ্র দেশজুড়ে বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টিপাত প্রতি দশকে ৮ থেকে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। একই সাথে বৃষ্টিহীন দিনের সংখ্যা এবং ভারী বৃষ্টির দিনের সংখ্যা (rainfall extremes) দুটোই ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

উপকূলীয় অঞ্চল সমুহে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে লবণাক্ততা সমস্যা এবং পানি সম্পদ দূষণ বিগত দশকগুলিতে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে সমুদ্রস্তর বৃদ্ধি এবং মাটি অবনমনের কারণে উপকূলীয় জেলাসমূহে লবণাক্ত পানির প্রবেশ আরো বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের পানিসম্পদ

নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকভাবে প্রভাবিত হবে। এই বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আরও গবেষণা হওয়া উচিত এবং বিশেষ করে পরিবেশ এবং জনসাধারণের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পরিবেশগত সমস্যাগুলির একটি। বাংলাদেশেও জলবায়ু পরিবর্তন একটি চরম আশঙ্কার কারণ। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে বলে রাখা প্রয়োজন যে বিভিন্ন গবেষণায় এবং সংবাদপত্রের প্রকাশনায় পরিবেশের সমস্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের অনেক ঘটনাকে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়। এই প্রবণতাটি একই সাথে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের বিজ্ঞান ও গবেষণার জন্য ক্ষতিকর, সেই সাথে জনসাধারণ এবং সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপকেও ভুল পথে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের জলবায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবছর খরা এবং বন্যা হওয়া, এবং একই সাথে অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় এলাকাতে পানি স্বল্পতা, পানি দূষণ, ও লবণাক্ততা বাৎসরিক ঘটনা। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই দুর্যোগগুলি তীব্রতর হয়ে উঠছে, তবুও সমস্ত পরিবেশ-দুর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। শুধু উপযুক্ত গবেষণা এবং প্রমাণসহ এই দুর্যোগগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট করা উচিত। একই সাথে শিক্ষা, গবেষণা, ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ আইনের প্রয়োগ, এবং জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা উচিত।

তথ্যসূত্র

Akanda, A.S. 2012, South Asia's water conundrum: hydroclimatic and geopolitical asymmetry, and brewing conflicts in the Eastern Himalayas. International journal of river basin management, 10(4), pp.307-315.

Akanda, A.S., Jutla, A.S., Alam, M., De Magny, G.C., Siddique, A.K., Sack, R.B., Huq, A., Colwell, R.R., Islam, S. 2011, Hydroclimatic influences on seasonal and spatial cholera transmission cycles: implications for public health intervention in the Bengal Delta. Water Resources Research, 47(3).

Akanda, A.S., Aziz, A., Jutla, A., Huq, A., Alam, M., Asham, G.U., Colwell, R.R. 2018, Satellites and cell phones form a cholera early-warning system. Eos Trans. Am. Geophys. Union, 99.

Babel, M.S., Wahid, S.M. 2011, Hydrology, management and rising water vulnerability in the Ganges–Brahmaputra–Meghna River basin. Water International, 36(3), pp.340-356.

Biswas, N.K., Hossain, F., Bonnema, M., Aminul Haque, A.M., Biswas, R.K., Bhuyan, A., Hossain, A. 2020, A computationally efficient flash flood early warning system for a mountainous and transboundary river basin in Bangladesh. Journal of Hydroinformatics, 22(6), pp.1672-1692.

Chowdhury, M.R., Ward, N. 2004, Hydro-meteorological variability in the greater Ganges–Brahmaputra–Meghna basins. International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society, 24(12), pp.1495-1508.

Getirana, A., Biswas, N.K., Qureshi, A.S., Rajib, A., Kumar, S., Rahman, M., Biswas, R.K. 2022, Avert Bangladesh's looming water crisis through open science and better data. Nature, 610 (7933), pp.626-629.

Hasan, M.A., Islam, A.S., Akanda, A.S. 2018, Climate projections and extremes in dynamically downscaled CMIP5 model outputs over the Bengal delta: a quartile-based bias-correction approach with new gridded data. Climate Dynamics, 51, pp.2169-2190.

Imran, H.M., Kala, J., Uddin, S., Islam, A.S., Acharya, N. 2023, Spatiotemporal analysis of temperature and precipitation extremes over Bangladesh using a novel gridded observational dataset. Weather and Climate Extremes, 39, p.100544.

Kirby, M., Mainuddin, M., Palash, W., Qadir, E., Shah-Newaz, S.M. 2014, Bangladesh Integrated Water Resources Assessment supplementary report: approximate regional water balances.

Palash, W., Jiang, Y., Akanda, A.S., Small, D.L., Nozari, A., Islam, S. 2018, A streamflow and water level forecasting model for the Ganges, Brahmaputra, and Meghna Rivers with requisite simplicity. Journal of Hydrometeorology, 19(1), pp.201-225.

Palash, W., Akanda, A.S., Islam, S. 2020, The record 2017 flood in South Asia: state of prediction and performance of a data-driven requisitely simple forecast model. Journal of Hydrology, 589, p.125190.

Sarkar, B., Islam, A., Majumder, A. 2021, Seawater intrusion into groundwater and its impact on irrigation and agriculture: Evidence from the coastal region of West Bengal, India. Regional Studies in Marine Science, 44, p.101751.

Shamsudduha, M., Taylor, R.G., Haq, M.I., Nowreen, S., Zahid, A., Ahmed, K.M.U. 2022, The Bengal water machine: Quantified freshwater capture in Bangladesh. Science, 377(6612), pp.1315-1319.

Sreeraj, P., Swapna, P., Krishnan, R., Nidheesh, A.G., Sandeep, N. 2022, Extreme Sea level rise along the Indian Ocean coastline: Observations and 21st century projections. Environmental Research Letters, 17(11), p.114016.

Steckler, M.S., Oryan, B., Wilson, C.A., Grall, C., Nooner, S.L., Mondal, D.R., Akhter, S.H., DeWolf, S. and Goodbred, S.L. 2022, Synthesis of the distribution of subsidence of the lower Ganges-Brahmaputra Delta, Bangladesh. Earth-Science Reviews, 224, p.103887.

World Bank, 2011. Climate Change and Adaptation Country Profile for Bangladesh. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2018-10/wb_gfdrr_climate_change_country_profile_for_BGD.pdf